KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher নবীন প্রকাশন
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol & Number ৪৯/৯ ৪৯/১০ ৪৯/১২	Year of Publication পৌষ ১৩৯৫ // Jan 1989 মাঘ ১৩৯৫ // Feb 1989 চৈত্র ১৩৯৫ // April 1989
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ দশম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় (১৯৪৫-৪৭) নিয়ে প্রামানিক তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক সুনীল সেনের সারগর্ভ আলোচনা।

১৮৫৫ সালের বিদ্রোহের পর সাঁওতালদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার যেসব পরিবর্তন শুরু হয়েছিল "ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন" নিবন্ধে আলোচনা এবার তাই নিয়ে। ঝাড়খণ্ডীদের বর্তমান তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

দেশের বিপুল শ্রমশক্তিকে অকেজো রেখে শিল্পকাঠামো এবং প্রশাসনের নানা স্তরে যেরকম দ্রুত হারে কমপিউটারের প্রয়োগ হচ্ছে তা অগ্রগতি না ঘটিয়ে কিভাবে দেশকে অধোগতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে কমলেন্দু ধরের "ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকসের প্রাসঙ্গিকতা" নিবন্ধে থাকছে তারই তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ।

প্রখ্যাত ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, সুলেখক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন সমীর ঘোষ।

আজহারউদ্দিন খানের গ্রন্থসমালোচনাভিত্তিক আলোচনায় থাকছে কাজী আব্দুল ওদুদের সৃষ্টির নূতন মূল্যায়ন।

অসমীয়া কবিতা নিয়ে ড. সৌমেন সেনের আলোচনা।

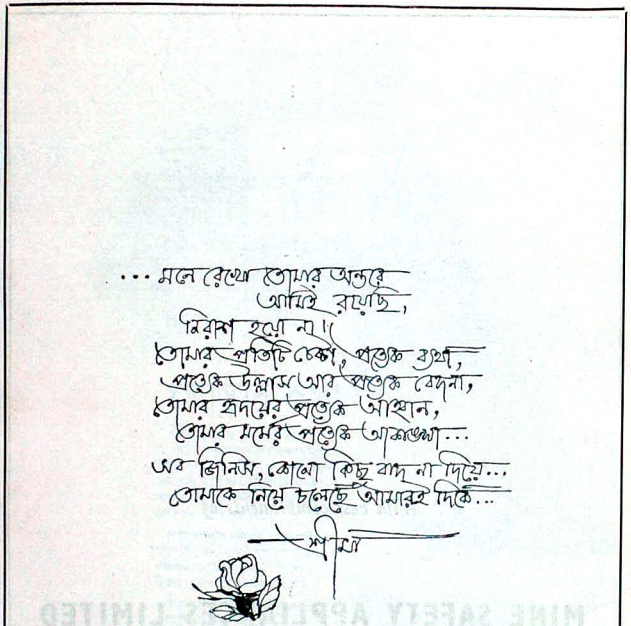

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক কথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শমী

বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ১০
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯
মাঘ ১৩৯৫

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুনীল সেন ৮৪৫
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৮৫০
বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি সুধীর সেন ৮৭০
ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা কমলেন্দু ধর ৮৮০
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৮৯২

কেন সাজাও কিরণশঙ্কর মৈত্র ৮৬৬
ভাসান দেবী রায় ৮৬৭
পুরনো শব্দ অজয় নাগ ৮৬৮
পৃথিবী যখন হিরোশিমা হোসাইন কবির ৮৬৯

গ্রন্থসমালোচনা ৮৯৮
আজহারউদ্দীন খান, সৌমেন সেন, পরিমল চক্রবর্তী,
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, কামাল হোসেন

চিত্রকলা ৯১৬
চিত্রী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ সমীর ঘোষ

মতামত ৯১৯
অনিন্দ্য সেন, কল্যাণকুমার দত্ত

নাটক ৯২৪
বিবিধের মাঝে মিলন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, ১৯৪৫-৪৭

সুনীল সেন

এক

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: '১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি সূচিত করেছিল, যে সংগ্রামের শুরু প্রায় সিকি শতাব্দী আগে।' আধুনিক গবেষণার আলোকে ড. মজুমদারের এই মন্তব্য অগ্রাহ্য হবে বলে মনে হয়।

১৯৪২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন দেশের বহু অঞ্চলে, বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বাঙলার মেদিনীপুরে, গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল। কংগ্রেস-পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের এটাই শেষ অধ্যায়। কিন্তু ১৯৪৫-৪৭ কালপর্বে ভারতে গণ-অভ্যুত্থানের এক নতুন তরঙ্গ দেখা গেল। মনে হয়, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক অবস্থার যে মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল, ভারতের গণজাগরণ তার অঙ্গ। চীনে, উত্তর ভিয়েতনামে, উত্তর কোরিয়ায় সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৯৪৬-৪৯); বর্মা-মালয়-ইন্দোনেশিয়ায় ছোটো-ছোটো কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে নিজেদের স্থাপিত করেছিল।[১] শতাব্দীর পুরনো ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান তখন আসন্ন।

ব্রিটিশদের বর্মা দখল এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয় সত্ত্বেও জনমানসে যে প্রত্যাশা জমে উঠেছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-আন্দোলনে। নেহরু ঠিকই লিখেছেন, ভারতের ইতিহাসে এত 'ঐক্যবদ্ধ আবেগ এবং উন্মাদনা' ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। সম্প্রদায়জাতিদলমতনির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের সমাবেশ সত্যি অভূতপূর্ব। সেদিন দেখা গেল, বিভিন্ন সভায় ও মিছিলে সহস্র-সহস্র মানুষের যোগদান; তাদের মুখে "জয় হিন্দ" ধ্বনি। কংগ্রেস থেকে হিন্দু মহাসভা—সকল রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল। কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সুবিশাল জনসভায় একই মঞ্চে দেখা গেল নেহরু, প্যাটেল এবং শরৎচন্দ্র বসুকে।[২] নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিবিম্বিত গৌরব শরৎচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। তিনি হঠাৎ হলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা।

২১ নভেম্বর কলকাতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘটের

আহ্বান জানাল বামপন্থী ছাত্রসংগঠন। সশস্ত্র বাহিনী ছাত্রমিছিল অবরোধ করল ধর্মতলা স্ট্রীটে; 'কদম-কদম বাড়ায়ে যা' গাইতে-গাইতে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় অবস্থান-ধর্মঘট শুরু করল। শরৎচন্দ্র বসু ধর্মঘটী ছাত্রদের আবেদন অগ্রাহ্য করে তাদের অবস্থান-ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন; কিরণশঙ্কর রায় ধর্মঘটকে নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন; মুসলিম লীগও ধর্মঘটের বিরোধিতা করল। সন্ধ্যায় মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ চলল; নিহত হলেন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কলেজের ছাত্র) এবং কদম রসুল (তরুণ শ্রমিক)। পরের দিন (২২ নভেম্বর) কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল সাধারণ ধর্মঘট। কংগ্রেস নেতৃত্বের সাধারণ বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসসেবী দুজন মহিলা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি (ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথের মেয়ে) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী ছাত্রদের পাশে ছিলেন।[৩] মহীয়সী মহিলা জ্যোতির্ময়ী ছাত্রমিছিলের সঙ্গে যেতে-যেতে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন।

দমননীতির মুখে ছাত্র-আন্দোলন সাময়িকভাবে থেমে গেল। ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) রসিদ আলি দিবসে আরো জঙ্গি বিক্ষোভ দেখা গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তি দাবি করে মুসলিম ছাত্রলীগ ছাত্রধর্মঘটের আহ্বান জানাল; তাদের আবেদন সমর্থন করল কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশন। সুবিশাল মিছিল অগ্রসর হল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে। সশস্ত্র বাহিনীর অবরোধের ফলে ছাত্রছাত্রীরা শুরু করল অবস্থান-ধর্মঘট। ১২ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক ধর্মঘট কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। রাঁচী থেকে একদল সশস্ত্র বাহিনী কলকাতায় এল। পুলিশের গুলিবর্ষণে ৮৪ জন নিহত হলেন। জনতা রচনা করল অসংখ্য ব্যারিকেড। দু দিন ধরে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলেছিল। জনসভায় ভাষণ দিলেন গান্ধীবাদী নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মুসলিম লীগ নেতা সুরাবর্দী, কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী এবং ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। সুরাবর্দী স্বয়ং গভর্নর কেসিকে বন্দী ছাত্রদের মুক্তি দেবার অনুরোধ জানালেন। গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা পি. ই. এস. ফিন্নে কেসিকে জানালেন, মাটির নীচে ছাইচাপা আগুনের মতো বিক্ষোভ জমছে। এত গভীর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নি এই দেশে।[৪]

১৮ ফেব্রুয়ারি বোমবাইতে শুরু হল নৌবিদ্রোহ। "তলওয়ার" জাহাজের ১১০০ ভারতীয় ন্যাভাল রেটিংদের (naval ratings) নিয়ে বিদ্রোহের শুরু। নৌবিদ্রোহ প্রসারিত হয় করাচী এবং মাদ্রাজে; বিদ্রোহী রেটিঙদের সংখ্যা হল বিশ হাজার। বোমবাইতে নৌবিদ্রোহের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট হয়; ২১ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাস্তায়-রাস্তায় চলে ফৌজের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ; ২২৮ জনের মৃত্যু হয়; আহতদের সংখ্যা ১০৪৬। ১০টি পুলিশ চৌকি, ১০টি পোস্ট অফিস, ৯টি ব্যাঙ্ক ভস্মীভূত হয়। নিহত এবং আহতদের মধ্যে বেশির-ভাগই ছিল শ্রমিক। ১৯৪২-এর আন্দোলনে বোমবাইতে অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল বটে, কিন্তু কোথায়ও ফৌজ আর জনসাধারণের সরাসরি সংঘর্ষ ঘটে নি।[৫]

নৌবিদ্রোহ জনমানসে গভীর ছাপ ফেলেছিল। কলকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হল শ্রমিকদের সভা। রাজকীয় বিমান বাহিনীর কর্মচারীরা ধর্মঘটে শামিল হলেন মাদ্রাজ, বোমবাই, কলকাতা এবং যশোহরে। দেশে এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কোনোদিন দেখা যায় নি। জাতীয় নেতারা সেদিন "আইন-শৃঙ্খলা"র প্রতিনিধির ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্যাটেল এবং পান্তিল (পরবর্তী কালে যে এস. কে. পান্তিল নেহরু সরকারের খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন) প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। মুসলিম লীগের মুখ্য নেতা জিন্নাহ্, 'মুসলমান রেটিংদের' কাছে ধর্মঘট প্রত্যাহারের আবেদন জানান। একমাত্র সমাজতন্ত্রী দলের নেত্রী অরুণা আসফ আলি

মহাত্মাকে জানান, বোমবাইয়ে রাস্তার ব্যারিকেডে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রচিত হয়েছে তা অভিনব (পরবর্তী কালে অরুণা সমাজতন্ত্রী দল পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন)। শেষ পর্যন্ত নৌ-ধর্মঘট কমিটি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। কমিটির এক ইশতাহারে লেখা ছিল: 'এই সর্বপ্রথম সেনা বিভাগে কর্মরত মানুষের রক্ত আর রাস্তার সাধারণ মানুষের রক্ত একসঙ্গে মিশে গেল এক অভিন্ন আদর্শের জন্য।'[৬]

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র রজনী পাম দত্তের মত খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা নিয়েছিল ২২ জানুয়ারি, ১৯ ফেব্রুয়ারি নয়; নৌবিদ্রোহ মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ; সাধারণভাবে ভারতীয় সেনা ব্রিটিশ রাজের অনুগত ছিল।[৭] নৌবিদ্রোহ সম্বন্ধে গবেষণা অসম্পূর্ণ; আরো তন্নতন্ন করে এই অসাধারণ বিদ্রোহের আলোচনা হওয়া উচিত। তবু মনে হয় ড. চন্দ্রের মত গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহাসিকের থাকবে 'long-range vision over the past and over the future'—(ই. এইচ. কার যেমন বলেছেন)। সত্যি কি ভারতীয় সেনার মানসিকতায় গভীর পরিবর্তন আসে নি? শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মঘট এবং প্রতিরোধ কি তাদের উন্নত চেতনার প্রকাশ নয়? যে পুলিশ বাহিনী ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সরকারের অবিচল সমর্থক ছিল, তাদের মধ্যে কি নৌবিদ্রোহ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি?

বিহারের পুলিশ ধর্মঘট প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। ১৯৪৭-এর মার্চের শেষ সপ্তাহে পাটনা, গয়া এবং মুঙ্গেরে পুলিশ ধর্মঘট শুরু হল। ট্রাকে করে বিদ্রোহী পুলিশ গ্রামদেশ পরিক্রমা করল; তাদের মুখে ধ্বনি: 'গোলি কা বদলা, গোলি সে লেঙ্গে।' গোর্খা বাহিনী নিয়োগ করে পুলিশ বিদ্রোহ দমন করা হল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী সরকারি কর্মচারী লিখেছেন: '...a police mutiny spread throughout the province and had to be put down by the military...'। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দুঃখ করে বলেছিলেন, স্বাধীনতা যখন আসন্ন, তখন এই ধরনের বিক্ষোভ কেন? এর উশকানি দিয়েছে কমিউনিস্ট দল।[৮] আমরা পরে দেখব কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল, আর. এস. পি প্রভৃতি দলের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা তখন তুঙ্গে।

দুই

১৯৪৬ সালের ২৬ জুলাই "ঈস্টার্ন ইকনমিস্ট" লিখেছিল: 'ধর্মঘটের ঢেউ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। তার আওতার মধ্যে এসেছে কলকারখানা—ওয়ার্কশপ, প্রেস, অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল, ওয়াটার ওয়ার্কস, পাওয়ার-হাউস, রেলওয়ে, বাস, এমন-কী সরকারি বিভাগ-গুলি পর্যন্ত...' রজনী পাম দত্তের মতে, শ্রমিক আন্দোলন তার শীর্ষে পৌঁছেছিল ১৯২৮ সালে, যখন শ্রমিকরা বার-বার ব্যবহার করেছিল তাদের শেষ অস্ত্র—সাধারণ ধর্মঘট। ১৯২৮-এ ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ২০০, ১৯৩৯-এ ৪০৬, ১৯৪৫-এ ৮২০ আর ১৯৪৬ সালে ১৬২৯ (ধর্মঘটে যোগদাতা শ্রমিকদের সংখ্যা ১,৯৪১,৭৪৮ জন)।[৯]

ভারতে ইতিপূর্বে এত অসংখ্য শ্রমিক-ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় নি। এই ব্যাপক ধর্মঘটের পটভূমিকা কলে-কারখানায় ছাঁটাই (বিশেষ করে অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি, ইনজিনীয়ারিং কারখানা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, পাটকল), মুদ্রাস্ফীতি এবং সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারির প্যারাডাইস এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি।[১০] সুকোমল সেনের হিসাবমতো, সারা ভারতে ছাঁটাই শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।[১১] মনে রাখা দরকার, যুদ্ধের সময় কারখানায় মজুরনিয়োগ বৃদ্ধি

পেয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, দক্ষিণ ভারতীয় রেলে ধর্মঘট (২৫ অগস্ট, ১৯৪৬) অভিনব। ভি. ভি. গিরি রেলশ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম সারির নেতা হলেও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কোনো কেন্দ্রে রেলওয়ে ধর্মঘট হয় নি। প্রধানত নীচুতলার কর্মচারীদের অবিরাম চাপের আঘাতে ডাক-তার বিভাগে অনুষ্ঠিত হল সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট। ২৯ জুলাইকে বোধহয় বলা চলে শ্রমিক আন্দোলনের ক্লাইম্যাক্স। কলকাতায় সেদিনের সাধারণ ধর্মঘট অবিস্মরণীয়। জামশেদপুরে সাধারণ শ্রমিকদের চাপে ইস্পাত কারখানায় প্রতীক ধর্মঘট হল। এই প্রথম টাটার মতো মালিক শ্রমিকদের কিছু দাবি মেনে নিয়ে সমস্যার মীমাংসা করলেন, যার ফলে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হল না।

দ্বিতীয়ত, ধর্মঘট সংগ্রামের অবিচল নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত ট্রেডই উনিয়ন কংগ্রেস। ১৯৪৭-এ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আই.এন.টি.-ইউ.সি গঠনের যে প্রস্তুতি চলেছিল (যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্যাটেল, ভি. ভি. গিরি, গুলজারিলাল নন্দ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ) তা আদৌ দৈবাৎ ঘটনা নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম স্বাধীনতার পরে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে ১৯২০ সাল থেকে যে শ্রমিক-ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে গেল।

তৃতীয়ত, বড়ো-বড়ো কারখানায় নারীশ্রমিকদের যোগদান তেমন চোখে পড়ে না। মরিস ডি মরিসের হিসাব থেকে জানা যায়, ১৯২৮-এ women labour force ছিল ১৬·৬ শতাংশ, ১৯৩৯ সালে ১৩·৯ শতাংশ আর ১৯৪৬-এ ১১·৮ শতাংশ।[১২] অর্থাৎ, ছাঁটাইয়ের অস্ত্র প্রথমে পড়েছে নারীশ্রমিকদের ওপর; বেশির-ভাগ ইউনিয়ন হয়ে পড়েছিল "পুরুষদের দুর্গ"। ইউনিয়নভুক্ত মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য—১৯৪৪-এ ৪·১ শতাংশ, ১৯৪৫-এ ৪·৫ শতাংশ, ১৯৪৬-এ ৪·৯ শতাংশ, ১৯৪৭-এ ৬·৯ শতাংশ।[১৩] প্রভাবতী দাশগুপ্তা এবং সন্তোষকুমারীর মতো মহিলা-নেত্রী এই পর্বে দেখা যায় নি; মহিলা-নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৈত্রেয়ী বসু, সুধা রায়, বীণা দাস (পরে ভৌমিক), অহল্যা রাঙ্গনেকার, গোদাবরী পারুলেকর (বোমবাই)। দার্জিলিঙ এবং ডুয়ার্সের চা-বাগানের নারীশ্রমিক ব্যতিক্রম। চা-বাগানে নিযুক্ত নারীশ্রমিক প্রায় ৫০ শতাংশ। ১৯৪৫-এ গঠিত হয় দার্জিলিঙ চা বাগান ইউনিয়ন। ১৯৪৬-এর আইনসভার নির্বাচনে কিংবদন্তী নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণের বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ১৭টি বাগানে গণ্ডগোল শুরু হয়। প্রায় একই সময় ডুয়ার্সের বাগানে মজুররা ইউনিয়ন গঠন করে জনসভায় ধ্বনি দিলেন: 'বিলায়েতি মালিক লনডন ভাগো।' দার্জিলিঙ এবং ডুয়ার্সে নারীশ্রমিকরা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।[১৪]

অবিরাম শ্রমিকবিক্ষোভ ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নতুন প্রবণতা সম্বন্ধে সজাগ করেছিল। ১৯৪৬-এর ৩১ জুলাই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ডাক-তার ধর্মঘট এবং প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘটকে 'symptoms of a serious political situation' বলে বর্ণনা করেছিল।[১৫] ওয়াভেল ভারতসচিবকে এক তারবার্তায় জানালেন, এই মুহূর্তের প্রয়োজন হল কংগ্রেসের সমর্থন সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন; তাঁরা আশা কংগ্রেস 'কমিউনিস্টদের এবং নিজেদের দলের বামপন্থীদের' সংযত করতে পারবে।[১৬] ৫ অগস্ট আর-এক তারবার্তায় ওয়াভেল ভারতসচিবকে জানালেন, প্যাটেলের দৃঢ় প্রত্যয় যে কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতেই হবে, অন্যথায় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা এবং 'শ্রমিক অসন্তোষ' বন্ধ করা দুঃসাধ্য।[১৭] ১৩ অগস্ট তিনি ভারতসচিবকে আবার লিখলেন, একমাত্র অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।[১৮] সর্দার প্যাটেলের ভক্তরা হয়তো পুলকিত হবেন না, তবু ওয়াভেলের মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো গেল না: Patel is strongly influenced by the capitalists and lives in the pocket of one of them, G. D. Birla।[১৯] ২ সেপটেমবর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। তার পুরোভাগে নেহরু।

সূত্রনির্দেশ

১. Crozier, South-East Asia in Turmoil, Penguin, 1965.

২. বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য (সং), India's Struggle for Independence, Viking, 1988, ৩৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. আর. জি. কেসির ডায়েরি, ১৯৪৪-৪৫, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, Post-war Upsurge; জগন্নাথ সরকার এবং অন্যান্য (সং), India's Freedom Struggle, 1986.

৪. P. E. S. Finney's Note, কেসির ডায়েরি, ১৯৪৪-৪৫; চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। মিছিলে যোগদানকারী ছাত্রীদের নেতৃত্ব করেন গীতা মুখার্জি, অলকা মজুমদার প্রভৃতি।

৫. বি. সি. দত্ত, Revolt of the Ratings, N. R. Ray (সং), *Challenge*, 1984; N. Mansergh (সং), *The Transfer of Power*, vol. VI; বোমবাইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী কর্মচারী লিখেছেন: 'The whole town of Bombay rose in a blazing crescendo of rioting in response to the mutiny···there were flights of bombers over the frigates···' V. G. Mathews, *Memoirs of Official Life*, 1931-47, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

৬. R. P. Dutt, India Today, 1947, পৃ ৪৭৩-৭৪। পাম দত্ত লিখেছেন, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদির আর প্রয়োজন নেই বলে বিবৃতি দেন।

৭. চন্দ্র, ঐ।

৮. Bihar Legislative Assembly Debates, vol. II, March, 1947। পুলিশ ও গোর্খা সেনার মধ্যে গুলি বিনিময় চলে। সরকারি বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন বিহারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টরা অনেক রাজনৈতিক প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ ছিল। G. M. Ray, Memoirs of Official Life, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি। তিনি আরো লিখেছেন, শুধু পুলিশ নয়, জেলের ওয়ার্ডার এবং হাসপাতালের নার্সরাও ধর্মঘটে শামিলহয়ে ছিল।

৯. J. S. Mathur, Indian Working Class Movement, 1964, পৃ ৫২।

১০. বাঙলায় ধর্মঘটের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে রণজিৎ গুপ্ত, আই. সি. এস. কেসিকে বলেছিলেন, ব্রিটিশ মালিকরা ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হল না, ইউনিয়নের স্বীকৃতিদানেও তাদের অনীহা; বোমবাই-এর অবস্থা বাঙলার তুলনায় 'অনেক ভালো'। কেসির ডায়েরি, চতুর্থ খণ্ড।

১১. সুকোমল সেন, Working Class of India, 1979, পৃ ৪০২।

১২. M. D. Morris, Large-Scale Industry, Cambrige Economic History of India, vol. 2, 1983, পৃ ৬৪৫।

১৩. মাথুর, ঐ।

১৪. S. Bhowmik, Class Formation in the Plantation System, 1981, পৃ ১৪৬-৪৭। চা-বাগে মহিলা মজুরদের আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের বই The Working Women And Popular Movements In Bengal, 1986, পৃ ৭৩-৭৪,।

১৫. ম্যানসারগ (সং), ষষ্ঠ খণ্ড, ফাইল নং ২৪।

১৬. ঐ অষ্টম খণ্ড, ফাইল নং ৯৬।

১৭. ঐ ফাইল নং ১২১।

১৮. ঐ ফাইল নং ১৪৬।

১৯. ম্যানসারগ (সং) নবম খণ্ড, ফাইল নং ৫৬১

এই রচনার দ্বিতীয় কিস্তি মার্চে আর শেষ কিস্তিতে এপ্রিলে প্রকাশ্য।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৯.১১

১৮৫৫-র হুলের অভিজ্ঞতা থেকে সাঁওতালরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসে। তা হল সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ যথাসম্ভব বর্জনীয়। প্রতিরোধের পদ্ধতি পালটাল বটে; কিন্তু প্রতিরোধের পথ তারা বর্জন করে নি।

বস্তুত, সাঁওতালরা নানাভাবে আগের থেকেও অনেক বেশি বিপন্ন বোধ করছিল। সংগঠিত বিক্ষোভের মধ্যে তাই তারা পরিত্রাণের উপায় খুঁজেছে— যেমন, ১৮৬১, ১৮৬৫, ১৮৭১-৭২, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮১-৮২ সালে।

এদের কারণ বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। সংক্ষেপে উল্লেখ করব মাত্র।

হুলের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা তাদের পরম শত্রু মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ফল হল উলটো। আগেই বলেছি, হুল সাঁওতাল সমাজে এবং তার অর্থনীতিতে কী নিদারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। মহাজনের শরণ তাই অপরিহার্য হল। নূতন চাষবাস তাদের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব ছিল—বিশেষ করে জমিদারি অঞ্চলে। জমিদার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাল না। তা ছাড়া, বিদ্রোহোত্তর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে সাঁওতাল অঞ্চলের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই দূর হয়ে যায়; ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় মহাজনরা আরো জাঁকিয়ে বসল।[১৭৫] মহাজনি শোষণের অজস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় নি।

নতুন এক উপদ্রব—জমিদারি এলাকায় উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধি। পুরনো দস্তুর সম্পূর্ণভাবে ভেঙে নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে জমিদার খাজনা বাড়িয়ে চলল। বহু ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশেই তা করা হয়। খাজনা-বৃদ্ধিতে যাতে কোনো বাধা না আসে, সেজন্য জমিদার সাঁওতাল-মাঝিদের কী ভাবে অপসারিত করার চেষ্টা করে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। সাঁওতালদের চিরাচরিত অরণ্যের অধিকার নানাভাবে সঙ্কুচিত করা হল। সমগ্র সাঁওতাল সমাজ এক অভূতপূর্ব সংকটের

সম্মুখীন হয়—সংকট শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিকও। যে সমাজসংগঠনে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস এবং নৈতিক বোধ প্রতিফলিত হয়েছিল, তা বহু জায়গায় আস্তে-আস্তে ভেঙে পড়ছিল।

আগেই বলেছি, ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সাঁওতাল বিক্ষোভের একটা বৈশিষ্ট্য এর আঞ্চলিকতা। "আঞ্চলিকতা" কিন্তু আন্দোলনের সীমাবদ্ধ প্রসার অর্থেই প্রযোজ্য। এর অর্থ এ নয় যে, সাঁওতালরা শুধু বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমস্যার কথাই ভাবছিল। আঞ্চলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আন্দোলনের শুরু। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা যাই হোক, সমাধান-সম্পর্কিত চিন্তাধারণায় ১৮৮৫ সালের বিদ্রোহী মানসিকতার বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলি বার-বার ফিরে-ফিরে এসেছে। তাই ভৌগোলিক ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চেতনার দিক থেকে এ আন্দোলনগুলি ১৮৫৫-র হুলের সমগোত্রীয়।

এ চেতনার দুটি বিশিষ্ট দিক: সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, আর এর বাস্তব রূপায়নের জন্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোনো নেতার ওপর নির্ভরশীলতা। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য আন্দোলন নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৬১ সালের বিক্ষোভ হুমকা সাবডিভিশনের হেণ্ডোয়া জমিদারিতে—য়ুরোপীয় ম্যানেজার বার্নসের খাজনা-বাড়ানোর নানা কৌশলের বিরুদ্ধে। আগের মতো এবারও সাঁওতালরা ভেবেছিল, স্থানীয় প্রশাসন সাঁওতালদের হয়ে হস্তক্ষেপ করবে। সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনর টেলরের কাছে তারা আর্জিও পেশ করে। টেলরের জবাব থেকে তাদের ধারণা হল, বার্নসকে দস্তুর-বিরোধী খাজনা বাড়ানোর চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সাঁওতাল-পরগনার কমিশনার নিজেই স্বীকার করেছেন: 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সাঁওতালরা তার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে···শুধু সাঁওতালরা নয়, অন্য জাতির লোকেরাও একই কথা বলছে: নালিশ করা অর্থহীন; সাহেব সব সময় বলে, আগামী কাল এসো।'[১৭৬]

এ আশাভঙ্গ থেকেই তাদের বিক্ষোভের শুরু। প্রথমে তারা ভেবেছিল, কলকাতায় ছোটোলাটের কাছে আর্জি পেশ করলে হয়তো কিছু সুরাহা হবে। কিন্তু ফল কিছু হল না। তাদের তীব্র অসন্তোষের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনের সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর কয়েকটা দিক উল্লেখযোগ্য। 'হুলের' সময়ের মতো সাঁওতালরা নানা জায়গায় বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হল; পাঠানো হল তিন পাতার শালের ডাল। টেলরের ধারণা, তাদের প্রিয় নেতা কানুর এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে: 'ছ বছরের মধ্যে আবার এক বিদ্রোহ শুরু হবে; তাদের নেতা হিসেবে সে আবার ফিরে আসবে।'[১৭৭] আসলে হুলের সময় কানুর এ ধরনের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শোনা যায় নি। সম্ভবত, এটা নতুন প্রচার। কিন্তু সাঁওতালদের কাছে তার আকর্ষণ প্রবল। এ আন্দোলনের নেতা সুন্দর মাঝির উপর কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আরোপিত হয় নি। সাঁওতালরা কানুর পুনরাবির্ভাবের কথাই বলেছে। হুলের শেষের দিকে কানুর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বন্দী সাঁওতালদের কেউ-কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু পুরনো বিশ্বাস আবার ফিরে এল।

১৮৬৫ সালের আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব আরো স্পষ্ট। উল্লেখযোগ্য, কোনো বিশেষ এলাকার সাঁওতাল-দের অভাব-অভিযোগ থেকে এ আন্দোলন শুরু হয় নি। সরকারি মহলেরও ধারণা, এর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না।

তবে সাঁওতালদের আচার-আচরণ প্রতিক্রিয়া থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হুলের সময় থেকে সাঁওতাল মানসিকতায় কোনো-কোনো প্রভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। আগেই বলেছি, পরবর্তী যে-কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্গে কতগুলো ধারণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। যেমন, নেতা সাঁওতাল জনসাধারণ থেকে

স্বতন্ত্র ; দৈবীশক্তির অধিকারী। একটা মূল আদি-কল্প বার-বার ফিরে এসেছে। বস্তুত, সমাজ- ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য সাঁওতালদের গভীর আকুতি থেকেই এ বিশেষ নেতার আবির্ভাবে তাদের বিশ্বাসের জন্ম।

১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনার জানতে পারেন, সাঁওতাল সমাজে আবার এক অস্থিরতা, চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। এর প্রধান রূপ : দলে-দলে সাঁওতালরা হাজারিবাগের দিকে যাচ্ছে ; কারণ গুজব রটেছে, হাজারিবাগের শ্রীরামপুর অঞ্চলে এক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। তার দর্শনলাভের জন্যই সাঁওতালদের এত অধীর আগ্রহ। এ নতুন দেবতা আর কেউ নয় : রামগড় সেনাবাহিনীর এক সৈনিক—কারু মাঝি। তখন অবশ্য সে আর সৈনিক ছিল না।

কানু-সিধুকে যে ধরনের দৈবীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলে বিশ্বাস করা হত, এ ক্ষেত্রে তা হয় নি। বরং লৌকিক বিশ্বাসের কোনো-কোনো দিক এ সময়কার গুজবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, দুরারোগ্য অসুখ সারানোর ক্ষমতা আছে কারু মাঝির ; সে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি, বন্ধ্যা নারী আর গোরুর প্রজননক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ[১৭৮] থেকে কারু মাঝি সম্পর্কে আরো কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এক কনস্টেবল রামসহায় রামকে ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছিল কারুর হাবভাব বোঝার জন্য। সে জানতে পারে, কারুকে সবাই 'গোসাঁই' বলে ভাবত। চাঁদ মাঝি বলে এক সাঁওতালও নানা গুজব শুনে কারুকে দেখতে যায়। দু আনা দিলে তাকে কাগজের চারটে চিরকুট দেওয়া হয়। তাকে বলা হয়, সবচাইতে বড়োটি সে যেন ঘরের মধ্যে রেখে দেয় এবং প্রতি মঙ্গলবার গ্রামে বেরুনোর সময় সঙ্গে রাখে ; এতে তার মঙ্গল হবে ; আর গ্রামে অসুখ-বিসুখের উপদ্রব হবে না।

কারু মাঝির কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে রামসহায় একটা ঘটনার উল্লেখ করে। কারুর বাড়িতে সাঁওতালদের জমায়েতে একজন উত্তেজিত হয়ে "লম্ফঝম্ফ" শুরু করে দিল। এ ধরনের উত্তেজনা আর আচরণ নাকি গতবারের হুলের সময়েই দেখা দিয়েছিল। তাকে সতর্ক করে দিয়ে কারু বলে, সে যদি এরকম করতে থাকে, তাহলে তাকে বেঁধে হাজতে পোরা হবে। কারুর উদ্দেশ্য ঠিক কী ছিল জানা যায় না। তবে এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তার দর্শনার্থীর মধ্যে অন্তত কেউ-কেউ শুধুমাত্র আধিব্যাধির দাওয়াইয়ের জন্য যায় নি ; তারা অন্য ধরনের অসন্তোষের কথা জানাতে চেয়েছে ; তাদের আচরণের মধ্যে নিরুদ্ধ আক্রোশের স্ফুলিঙ্গ মাঝে-মাঝে ঠিকরে পড়ছিল।

১৮৭১ সালের বিক্ষোভে এরকম কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। এ বিক্ষোভের পটভূমিকা নানা এলাকায় আকস্মিক খাজনা বৃদ্ধি।[১৭৯] হেণ্ডোয়ার জমিদার উদিতনারায়ণ সিংহ, বালানাতরার নতুন জমিদার গ্রানট, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন শংকরার জমিদার, গোদার ইজারাদার, এবং আরো কেউ-কেউ সাম্প্রতিক কালে যথেচ্ছ খাজনা বাড়াচ্ছিল। প্রতিকারের জন্য সাঁওতালরা দুমকার সহকারী কমিশনারের কাছে আর্জি পেশ করে। কোনো প্রতিবিধান তো তিনি করলেনই না, নয়জন নেতৃস্থানীয় সাঁওতালকে দশ টাকা করে জরিমানা করলেন। কারণ হিসেবে বললেন, 'সাঁওতালরা জোট বেঁধে নালিশ করতে এসেছে।' বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা আদালতেও নালিশ করে ; কোনো ফল হয় নি। প্রশাসনের এ মনোভাবে সাঁওতাল-সমাজে এক তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা রটিয়ে দিল, আশু প্রতিকার না মিললে তারা ১৮৮৫ সালের মতো আবার বিদ্রোহ করবে। সরকারি প্রতিবেদন-মতে, ওই সময় থেকে চতুর্দিকে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। তাদের মূল কথা, বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা লুঠ-তরাজ শুরু করতে চলেছে। আসন্ন বিদ্রোহের সম্ভাবনায় দিখুসমাজে সন্ত্রাসের ভাব অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এমন-কী পরাক্রান্ত মহেশপুরের জমিদার গোপালচন্দ্র সিংহ বরকন্দাজের সতর্ক পাহারায় নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থেকে গেল। লুঠতরাজের ভয়ে অসাঁওতাল গ্রামবাসী চারদিকে পালাতে থাকে। সহকারী কমিশনারের জন্য যে পালকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার জন্য কোনো বেহারা মিলল না, কারণ সবাই পালিয়ে গেছে।

ওখানকার সাঁওতালদের মানসিকতায় পরিবর্তনও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮৫ সালে যা ঘটেছিল, এবারও তাই ঘটল। স্থানীয় দুটি নীলকুঠির সাঁওতাল শ্রমিক তাদের নেওয়া দাদন সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিয়ে দিল। তাদের স্পষ্ট জবাব—এ মরশুমে তারা কোনো কাজ করতে পারবে না ; কারণ তাদের হুলে যোগ দিতেই হবে।[১৮০]

৯.১২

১৮৭৪ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যেকার আন্দোলন অনেক পরিণত। ১৮৬১, ১৮৬৫ এবং ১৮৭১ সালের বিক্ষোভ থেকে তা স্বতন্ত্র তো বটেই, কয়েকটা দিক থেকে তা ১৮৮৫-র হুল থেকেও আলাদা। আমাদের পক্ষে প্রধান প্রাসঙ্গিক আলোচনা—এ সময় সাঁওতালদের ধর্ম আর রাজনীতি কী ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্যের দিক থেকে আগের আন্দোলনের সঙ্গে এ-সময়কার আন্দোলনের কোনো পার্থক্য নেই। স্বাধীন সাঁওতালরাজের স্বপ্ন এ আন্দোলনেরও মূল প্রেরণা। ১৮৮৫-র পর প্রায় দু দশকের মধ্যে সাঁওতাল অর্থনীতির উপর 'দিখু হুশমনদের' কর্তৃত্ব আরো পাকা হয়েছে। বিশেষ করে, ব্যাপক খাজনা-বৃদ্ধি, জমি আর অরণ্যে সাঁওতালদের ঐতিহ্যসম্মত নানা অধিকারের অবিরত সঙ্কোচন তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে দুঃসহ করে তুলেছে। স্বভাবতই, আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ আগের থেকে আরো স্পষ্ট হয়েছে।

১৮৬১-১৮৭১—এ দশকের আন্দোলনে এ রাজনৈতিক সুর খানিকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। এর একটা প্রধান কারণ আমরা আগে উল্লেখ করেছি। নেতাদের আশঙ্কা ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করবে, যার ফলে ১৮৮৫ সালের মতো নির্মম নিপীড়ননীতি গ্রহণ করা হবে। এ নিপীড়ননীতির ভয়াবহ ফল নেতারা ভোলে নি।

১৮৭৪ সালের আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র একেবারে গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট। এর নেতা ভগীরথ মাঝি ১৮৬৮ সাল থেকেই সাঁওতালদের নানা বিক্ষোভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ওই বছর তাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়। সে নাকি রটনা করে বেড়াচ্ছিল, ব্যাপক এক সাঁওতালবিদ্রোহ আসন্ন-প্রায়।[১৮১] বাউসীর যে হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের "অভিষেক" হয়, সেখান থেকেই সে নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। সাঁওতাল-পরগনার উপ-কমিশনার বক্সওয়েল জানতে পারেন, সে জমায়েতে বহু সাঁওতাল বার-বার ১৮৫৫ সালের 'হুল, 'পুরোনো সুবা, ঠাকুর, রাজ' সম্পর্কে বলাবলি করেছে।[১৮২] এক খ্রীষ্টান মিশনারির সাক্ষ্য অনুযায়ী, বাউসীর মন্দিরে ভগীরথকে "রাজা" বলে ঘোষণা করা হয় ; নতুন সাঁওতালরাজের সাফল্যকামনায় প্রার্থনাও করা হয়।[১৮৩] বাউসীর মন্দির থেকে ফেরার পর সাঁওতাল মানসিকতার আমূল রূপান্তর প্রসঙ্গে এ মিশনারির বিবরণ : তখনই ভগীরথের শিষ্যরা অনবরত বলছিল, তাদের সুদিন আবার শীগগির আসছে ; তাদের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে ; সাহেবদের সব খতম করা হবে, বা এ মুলুক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ; এদেশী খ্রীষ্টানদের 'অন্যলোকে' নির্বাসন দেওয়া হবে।[১৮৪]

এসব প্রচারের মধ্যে রাজদ্রোহের আভাস পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ভগীরথ এবং তার এক ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনের শক্তি এতে কমল তো নাই, বরং ভগীরথ-অনুগামীরা নতুন-নতুন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা

করে। বলা হল, তারা আর কোনো খাজনা দেবে না; ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সরকারি অনুদান (প্রধানত খাদ্যশস্য) তারা ফেরত দেবে না। খাজনা বন্ধের সিদ্ধান্ত জমিদারিব্যবস্থার বৈধতাকে অস্বীকার করা। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যাপারে সাঁওতালদের অভিযোগ গোড়া থেকেই। বস্তুত, বস্তুত, ভগীরথ নেতৃত্বে আন্দোলনের অব্যবহিত উপলক্ষ এ বণ্টনপ্রসঙ্গে প্রশাসনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাঁওতালদের প্রতিবাদ। তাদের ক্ষোভের কারণ, মহাজন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সরকারের দেওয়া ধানচাল সহজেই পেয়ে যাচ্ছে; অথচ তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তখন থেকেই সাঁওতালদের নূতন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে করব। ভগীরথের গ্রেপ্তারের পর তার শিষ্য জ্ঞান মাঝি এক "দুঃসাহসিক কাজে"র পরিকল্পনা নেয়। সে পরোয়ানা মারফত সবাইকে বলে, খাজনার নূতন হার চালু না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতালরা কোনো খাজনাই দেবে না। সে আরো বলে, এ পরোয়ানা জারি করার অনুমতি তাকে দিয়েছে "বড়ো সাহেব" (অর্থাৎ কমিশনার)। জ্ঞান মাঝিকে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল। আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকল। নেতা হিসেবে এল ভগীরথের আর-এক শিষ্য ধোনা মাঝি। রাজমহলের বড়তলা অঞ্চলে সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, সারা দেশে সাঁওতালরাজ কায়েম হয়েছে। তাকেও হাজতে পোরা হয়। এর পর আন্দোলন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে; তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় চলতে থাকে।

এ সময় থেকেই সাঁওতালরাজের প্রতীক হিসেবে "খেরওয়ার" নামটির প্রচলন হল। স্বতন্ত্র উপজাতি হিসেবে এটাই ছিল তাদের আদি নাম।

১৮৮০-৮২-র আন্দোলনের রাজনৈতিক সচেতনতা আরো স্পষ্ট। সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার প্রচারে এখন কোনো গোপনীয়তা ছিল না। সরকার তাই এ আন্দোলন সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

এক খ্রীষ্টান মিশনারির প্রতিবেদনে[১৮৫] বলা হয়েছে, খেরওয়ার নেতারা সাঁওতালদের প্রকাশ্যে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছিল: 'জমি আমাদেরই; আমরাই জঙ্গল কেটেছি; তাই কোনো খাজনা আমরা দেব না; একজোট হয়ে আমরা ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াব।' তারা আরো বলেছিল: 'সাহেব এবং খ্রীষ্টান গুটিকয়েক মাত্র; আমরা সাফা সাঁওতালরা সংখ্যায় কত বেশি, এ দেশ আমাদেরই হবে; এ রাজ আমাদের।'[১৮৫ক] সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার এ দুর্বার সংকল্পের সঙ্গে সে সময়কার বিদ্রোহী আইরিশ কৃষক-মানসিকতার সাদৃশ্য খুঁজে পান ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার। আইরিশ কৃষকদের মতো 'সাঁওতালদের-[ও] স্বপ্ন, এমন দিন আসবে, যখন তাদের রাজস্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; কোনো খাজনা তাদের দিতে হবে না।' কমিশনারের সিদ্ধান্ত[১৮৬], 'একটা জিনিস আগে আমরা অত ভালো করে খেয়াল করি নি; বাইরের হাবভাব যাই হোক, ভেতরে-ভেতরে সাঁওতালরা তীব্র বিক্ষুব্ধ; বড়ো এক পরিবর্তনের জন্য তারা উন্মুখ। 'খেরওয়ার' নাম আসলে সম্পূর্ণ নূতন এক সংগঠনের ইঙ্গিত দেয়; বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ধারণা তাদের সামাজিক তথা ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে মিলে গেছে; তাদের কাছে এর আকর্ষণ প্রবল; ফলে ব্রিটিশরাজ-বিরোধী একটা সংগঠন ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে।'

১৮৮০ সালের অকটোবর থেকে এ আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উপলক্ষ আদমশুমারির জন্য সরকারি ব্যবস্থা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, আন্দোলনের প্রকৃতি জটিল; তার লক্ষ্য, অনেক সুদূরপ্রসারী। আদমশুমারির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে গোটা ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের তিক্ততা, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ক্রমেই ফেনিল হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় প্রশাসন তাদের মনোভাব বোঝার আদৌই চেষ্টা করে নি। তাদের ধারণা, আদমশুমারির

মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার জন্যই এ আন্দোলন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়। সত্যিই আদম-শুমারি সংক্রান্ত নানা অনুসন্ধানের অর্থ সাঁওতালদের কাছে বোধগম্য ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিকের বিচার্য বিষয়: আদম-শুমারির বিরোধিতার কারণ হিসেবে তাদের নিজেদের যুক্তি, আর এ বিরোধিতার বিশিষ্ট রূপ।

এ বিরোধিতা ছিল আসলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং এক্তিয়ারের প্রশ্ন। সাঁওতালরা বহু জায়গায় খোলাখুলি বলেছে, তারা সবাই দুবিয়া গোসাঁই-এর শিষ্য; গোসাঁইজীর খাতায় তাদের নাম উঠে গেছে; তাদের নাম আবার নথিভুক্ত করার কোনো অধিকার সরকারের নেই। কেউ-কেউ স্পষ্ট বলেছে, তাদের গুরুর নির্দেশেই তারা আদমশুমারির কাজে বাধা দিচ্ছে।

এ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে দিগুদের সম্পর্কে তাদের অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাসও প্রতিফলিত হয়েছে। ওই সময়কার নানা গুজব বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।[১৮৭]

একটা গুজব ছিল, আলাদাভাবে প্রতি সাঁওতালের নামধাম লিখে নেওয়া এবং প্রতি পরিবারের ঘর-বাড়িতে চিহ্ন বসানোর একটিমাত্র উদ্দেশ্য—সরকার নতুন করে মাথাপিছু কোনো ট্যাকসো বসানোর ফন্দি আঁটছে। আরো একটা ধারণা ছিল, আদমশুমারি আসলে সাম্প্রতিক খাজনা-বৃদ্ধিকে বৈধ করে নেওয়ার কুটকৌশলমাত্র। আরেকটা গুজব ছিল—একবার যদি সরকারি খাতায় নাম ওঠে, তাহলে পরে যে-কোনো উদ্দেশ্যে সরকার এ-নথিকে কাজে লাগাতে পারবে। কোথায় কিভাবে তারা গতর খাটবে, তাও নির্ভর করবে সরকারি মর্জির উপর। এরকম একটা ভয় ছিল—জোর করে ধরে নিয়ে তাদের যুদ্ধে পাঠানো হবে। তখনকার এক যুদ্ধক্ষেত্র আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তারা শুধু জানত, এটা তাদের মুলুক থেকে অনেক দূরে, একবার সেখানে গেলে আর ফেরা হবে না। একটা ব্যাপক গুজব ছিল—সমর্থ জোয়ান সাঁওতালদের জোর করে আসামের চা-বাগানে কুলি হিসেবে পাঠানো হবে। আড়কাঠিরা ছোটোনাগপুরের যেসব উপজাতীয়দের ভুলিয়ে-ভালিয়ে চা-কুলি হিসেবে পাচার করে দিয়েছিল, তাদের উপর অত্যাচারের নানা কাহিনী লোকমুখে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। চা-কুলির কাজ তাই তাদের কাছে বিভীষিকাময় ছিল। চা-বাগানে গেলে পারিবারিক বন্ধন এবং সংহতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে এ আশঙ্কাও তাদের ছিল। একটা কথা রটেছিল, পুরুষ সাঁওতালদের একদিকে, এবং নারী আর শিশুদের অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনও গুজব ছড়িয়ে-ছিল, আদমশুমারির আসল উদ্দেশ্য তাদের খ্রীষ্টান বানানো। তারা প্রকাশ্যেই বলত, পাদরিসাহেব আসলে হাকিমদের গুরু; তাই পাদরি যা বলবে হাকিম তা শুনবে।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, আদমশুমারির বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের জায়গাগুলিতে আগে থেকেই সাঁওতালদের নানা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আন্দোলন চলার সময় তাদের অন্যান্য অভিযোগও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কোনো-কোনো জায়গায় অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীও আন্দোলনে যোগ দেয়; তবে সংখ্যায় বেশি নয়।

তা ছাড়া, এ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে "খেরওয়ার" ধর্মসংস্কার আন্দোলনেও নতুন উদ্দীপনা আসে। জামতাড়া সাবডিভিশনে সহস্র-সহস্র বেনামি চিঠিতে সাঁওতালদের বলা হয়, তারা যেন সঙ্গে-সঙ্গে তাদের শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলে। তখন থেকে দুবিয়া গোসাঁইয়ের নামও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। অনেক দূর অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা এসে হাজারিবাগে দুবিয়ার মন্দিরে জমায়েত হত। উল্লেখযোগ্য, যেসব অঞ্চল থেকে তারা আসত, তাদের মধ্যে ছিল ১৮৬১ সালের ব্যাপক প্রতিরোধের কেন্দ্র হেজোয়া পরগনা।

সাঁওতালদের আচার-আচরণেও তখন বাইরের অনেকেই এক গভীর পরিবর্তন লক্ষ করে। এক সরকারি বিবরণমতে[১৮৮], তাদের চোখেমুখে "বিষাদ" আর "উদ্বেগে"র চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট; তারা যেন বিশেষ কিছুর প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ছিল; তাদের পরম আনন্দের উৎসব দুর্গাপুজার অনুষ্ঠান সে বছর হলই না। জামতাড়া ডিভিশনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সরকার-বিরোধী মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। তারা প্রতিবাদ জানায়, আদমশুমারির সব ভার দেওয়া হয়েছে বাঙালি তালুকদারের বাছাই লোকেদের ওপর; এদের থেকে সাঁওতালরা কী নিরপেক্ষতা আশা করতে পারে! আদমশুমারির সঙ্গে যুক্ত মিশনারিদেরও তারা শাসায়। একজনকে তারা বলে, লোকগণনার জন্য যারা গ্রামে আসবে, তাদের সবাইকে তারা খুন করবে। অন্য এক মিশনারির ধারণায়: 'কথায় আর কাজে তারা সম্পূর্ণ বিদ্রোহী।'[১৮৯] লোকগণনার সঙ্গে মিশনারিরা আর কোনো সংস্রব রাখে নি। নারায়ণপুরে বহু সাঁওতালের এক সমাবেশে নেতারা ঘোষণা করে, ১৮৫৫-র হুলে এখানকার ঘাটোয়ালকে সাঁওতালরা যেভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছিল, সেকথা যেন আদম-শুমারির লোকেরা মনে রাখে। কোনো-কোনো জায়গায় পুরনো নেতারাই এ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়।

'হুলে'র পর থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত সাঁওতাল আন্দোলনে তাই কয়েকটা পর্যায় লক্ষ করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে। সহিংস পন্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে পড়লেও সাঁওতালদের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। তার প্রধান লক্ষণগুলি আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

এ আন্দোলনগুলিতে ধর্ম এবং রাজনীতির যোগও প্রত্যক্ষ এবং গভীর। কিন্তু ধর্মবোধ কিভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়কে নির্ধারিত করতে পারে, এ সম্পর্কে সাঁওতালরা তখন সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছে। এ দিক থেকে এ সময়কার আন্দোলন-গুলি বিশিষ্ট।

নতুন ধ্যানধারণার মূল রূপ এই গভীর বিশ্বাস যে কয়েকটা বিশেষ দিক থেকে তাদের সমাজ আর ধর্মের আমূল রূপান্তর ছাড়া তারা 'মহান এক জাতিতে' পরিণত হতে পারবে না, আর সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও অপূর্ণ থাকবে।

১৮৫৫ সালের আন্দোলনে এ ধরনের কোনো ধারণাই আমরা দেখি না। আগেই বলেছি, দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর থেকেই সাঁওতালদের ধর্ম-চেতনায় নতুন লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে; যেমন, তাদের এ নিশ্চিত প্রত্যয় যে, ব্রিটিশবাহিনীর গোলাগুলি তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ তাদের জয় ঐশীশক্তি-অভিপ্রেত। কিন্তু সাঁওতালদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস, আচার, নীতিবোধ বা সামাজিক প্রথায় কোনো পরিবর্তন সিধু-কানু গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নি। তারা শুধু বলত, নতুন ঠাকুরের পুজোর উপকরণ যেন অনাবিল হয়; অর্থাৎ তারা আচার-অনুষ্ঠানগত শুদ্ধতার উপর জোর দিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সাঁওতালদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণ হিসেবে তারা শুধু বলেছে, তাদের অনুগামীদের কোনো 'অপরাধে'র জন্য এটা ঘটেছে। কী সে 'অপরাধ', তা তারা স্পষ্ট করে বলে নি।

সিধু-কানু হয়তো সাঁওতালদের চারিত্রিক শুদ্ধতার কথা ভেবেছিল। কিন্তু এ শুদ্ধতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে তাদের কোনো নির্দেশ ছিল না। এ শুচিতার সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির সংযোগ সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি। ১৮৬১-১৮৭১-এ দশকের আন্দোলনেও এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। ভগীরথ-পরিচালিত আন্দোলনেই (১৮৭৪-৭৫) সর্বপ্রথম এটা লক্ষ করা যায়। পরে তা ব্যাপক সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে সাঁওতাল-অঞ্চলে বিপুল নতুন উদ্দীপনার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্থানীয় জমিদার,

মিশনারি এবং অন্যান্য কেউ-কেউ তাদের ধারণার কথা বলেছে। একটা বিষয়ে তাদের মতৈক্য লক্ষণীয়। তারা প্রায় সবাই বলেছে, সাঁওতালরা নাকি বিশ্বাস করত, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার ছাড়া তাদের বৈষয়িক উন্নতি এবং "রাজনৈতিক অধিকার অর্জন" সম্ভব নয়।[১৯০] নানা জনের সঙ্গে কথা বলে সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনারেরও ধারণা হয়েছে, তাদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য সাঁওতালদের মনে এক তীব্র গ্লানি-বোধের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুরা তাদের হামেশাই বলত, 'বংগা' (বন্য?) সাঁওতাল, 'বোকা' সাঁওতাল। এই হীনম্মন্যতার ভাব দূর করার জন্যই সাঁওতালরা ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কথা ভেবেছিল।[১৯০ক] এ সংস্কারের আদর্শ হিসেবে তারা হিন্দুদের কোনো-কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার গ্রহণ করেছিল কেন —এ প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য উত্তর এই যে, একটামাত্র বিকল্প যে সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা হল হিন্দু-সংস্কৃতি। তা ছাড়া, তাদের ধারণা ছিল, তাদের উপর হিন্দু-দিকুদের অব্যাহত প্রভুত্বের উৎস উন্নত হিন্দু-সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি আর আচার।

নতুন এই ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের যে ব্যাখ্যা উপরে উল্লেখ করেছি, তা অংশত গ্রহণীয় মাত্র। এ আন্দোলনের অন্য এক ব্যাখ্যার বিচার-প্রসঙ্গে পরে আমরা এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে এ আলোচনার পদ্ধতি সংক্ষেপে নির্দেশ করব মাত্র।

সংস্কার আন্দোলনের জটিলতা এবং বহুমুখিতা এ ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে নি। সাঁওতালদের সম্পর্কে হিন্দু-সম্প্রদায়ের অপমানকর উক্তি আর আচরণ সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নয়। তাহলে এ আন্দোলন এক বিশেষ সময় শুরু হল এবং বিকাশলাভ করল কেন? হিন্দুদের আচরণ ছাড়া অন্য কিছু কি ঘটেছিল, যা এ সংস্কার-প্রয়াসকে প্রভাবিত করেছিল? এ সংস্কারকে সাঁওতাল-দের বৈষয়িক উন্নতির প্রধান উপায় বলে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র এর মধ্য দিয়ে বৈষয়িক উন্নতি কী ভাবে সম্ভব? এ সংস্কার আন্দোলন কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন কোনো ধারা? এর সঙ্গে সাঁওতালদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক কী? যদি দেখা যায়, ক্রমবিকাশমান রাজনৈতিক চেতনা এ সংস্কার-প্রয়াসকেও প্রবলভাবে উদ্দীপিত করেছে, তাহলে এ সংযোগ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

এ সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এর স্রষ্টা গোদা সাবডিভিশনের তালদিহা গ্রামের ভগীরথ মাঝির "রাজা" হিসেবে "অভিষেক" হয় ভাগলপুর জেলার বাউসীর প্রসিদ্ধ হিন্দু-মন্দিরে।[১৯১] মাতাদিন বলে এক উত্তর-ভারতীয় হিন্দু[১৯২] অভিষেকের অঙ্গ হিসেবে তার কপালে টিকা দেয়। অন্য এক মতানুযায়ী টিকা দেয় বৈষ্ণব গোসাঁই মঙ্গল দাস।[১৯২ক]

সমসাময়িক নানা বিবরণ থেকে জানা যায়, সাঁওতাল অঞ্চলে যেসব বৈষ্ণব গোসাঁই প্রচারের জন্য যেতেন, তাঁদের প্রভাবেই আন্দোলনের ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছে। "বাবাজি", "গোসাঁই" বলে তাদের লোকে ডাকত। ১৮৬৫ সালে আন্দোলনের নেতা কারু মাঝিরও পরিচয় ছিল "গোসাঁই" বলে। সরকারি প্রতিবেদনমতে এ বৈষ্ণব প্রচারকেরা সবাই 'একেবারে নীচু জাতের হিন্দু'। সম্ভবত এজন্যই হিন্দু জাতিভেদ-প্রথা সম্পর্কে তাদের খানিকটা ঔদার্য ছিল। তাদের প্রচারে প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের আদর্শও সাঁওতালদের আকর্ষণ করে।

সমসাময়িক বিবরণের ভিত্তিতে সাঁওতালদের নতুন ধর্মবিশ্বাস আর আচার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব।[১৯৩]

নতুন ধর্মবোধের মূলভিত্তি সাঁওতালদের উপাস্য নানা বোঙ্গার বদলে এক-ভগবানে বিশ্বাস। ১৮৮০ সালের এক সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গ্রামের মধ্যে প্রচারিত সহস্র-সহস্র বেনামি চিঠিতে

সাঁওতালদের বলা হয়েছে, আসন্ন বিপর্যয় এড়ানোর জন্য যেন প্রতিদিন ভগবানের নাম নেয়। সাঁওতাল মাঝিদের কেউ-কেউ বলত, ভগবানের একত্বে বিশ্বাস তাদের আদি ধর্মীয় ধারণার অঙ্গ; বহু দেবতা আর বোঙ্গার পূজার প্রচলন হয়েছে পরে; এটা তাদের আদি বিশুদ্ধ ধর্মচেতনার বিকৃতিমাত্র। এ মাঝিদের ধারণা অনুযায়ী, সৎ মানুষদের উপর বোঙ্গার কোনো কর্তৃত্বই নেই; অসৎ মানুষদের জন্যই বোঙ্গারা সৃষ্টি করে নানা উপদ্রব, আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশা।

সাঁওতালদের আদি ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, ১৮৫৫ সালের হুলের আগে এ ধরনের চিন্তার ব্যাপক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। সিধুকানু যে ভগবানের কথা বলত, তা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক বোঙ্গা নয়। কিন্তু বোঙ্গা-উপাসনা বর্জনের কথা তারা প্রকাশ্যে বলেছিল কিনা জানা যায় না। এক-ভগবানে নতুন বিশ্বাস যদি সাঁওতালদের আদি বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনও হয়, তাও সাঁওতাল নেতাদের সচেতন প্রয়াসের ফল। বৈষ্ণব-প্রচারকদের সংস্পর্শ এক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই প্রভাবিত করেছে।

সংস্কার আন্দোলনের অন্য দিকগুলির উপরও হিন্দু ধারণার প্রভাব অনস্বীকার্য—যেমন শুদ্ধ (সাফা) জীবনচর্যা। সাফা সাঁওতালদের কয়েকটা প্রধান করণীয় ছিল: যা কিছু অশুচি তা বর্জনীয়। নতুন বিশ্বাসমতে, শুয়োর আর মুরগি পোষা শুদ্ধাচার-বিরোধী; তাদের আশু সংহার তাই অবশ্য কর্তব্য। সাঁওতালদের নানা প্রথাসম্মত খাদ্যও পরিত্যাজ্য, যেমন গোরু আর শুয়োরের মাংস; নানা পালা-পার্বণে তাদের অতি প্রিয় পানীয় মদ্যকেও সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। নৈতিক চরিত্রেও সাফারা হবে শুদ্ধ, নিষ্কলুষ। রোজ স্নান করা ও শুচিবস্ত্র পরিধান শুদ্ধ জীবনযাত্রার অঙ্গ বলে গণ্য হত। সাফাদের কেউ-কেউ কপালে ফোঁটা নিত। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক নতুন ধর্মীয় আচার পাকুড় জেলার সাঁওতালদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১৯৪] এর প্রচলন করে সাঁওতালপরগনা সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার বড়তলা অঞ্চলের এক বৃদ্ধ সাঁওতাল চাঁদ রায়। বহু শিষ্য জড়ো করিয়ে চাঁদ তাদের কপালে "বেলা-টিকা" পরিয়ে দেয়; বৈচিত্র্যতীয় এক ধরনের ফলের রসের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে টিকা দেবার জিনিস তৈরি করা করা হত। 'সাফা'দের মধ্যে কেউ-কেউ ব্রাহ্মণদের মতো উপবীত ধারণ করত। রবিবারে কোনো কাজ না করার অনুশাসন সম্ভবত মিশনারি-দের প্রচারের ফল। তা ছাড়া, সাঁওতাল গুরুরা বলেছিল, যে ডাইনি-প্রথা সাঁওতাল সমাজের ঐক্য আর সংহতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় সংস্কার-আন্দোলনের আরো নানা বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে।[১৯৪ক]

উল্লেখযোগ্য এই, শুদ্ধাচারের যে ধারণা সংস্কার-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, তা প্রধানত হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারণা। শুয়োর-মুরগি পোষা, গোরু আর শুয়োরের মাংস খাওয়া, মদ্যপান ইত্যাদিকে সাঁওতাল বা অন্য উপজাতিরা কখনো গর্হিত কাজ মনে করে নি, শুদ্ধাচারবিরোধী তো নয়ই। শুয়োর আর মুরগি পোষা তাদের জীবিকার একটা প্রধান অবলম্বন। মদ্যপান তাদের যৌথ সমাজ-জীবন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। "পবিত্রতা"র নতুন ধারণা তাই সাঁওতাল সংস্কৃতি, সমাজ এবং অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ নয়।

নতুন সাফা সাঁওতালদের কাছে এসব সংস্কার শুধুমাত্র বিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না; এগুলি ছিল দৈনন্দিন জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ। শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলার সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অভিঘাত বিস্তারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়।[১৯৫] এ ধরনের ঘটনা আগে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটলেও, বাউসীর হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের অভিষেকের (২৪ জুলাই, ১৮৭৪) পর থেকে এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে শুরু হয়। ভগীরথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী সাঁওতাল গুরুর মতো তাকেও সাঁওতালরা অতিপ্রাকৃত শক্তির

অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। প্রায় বারো শ সাঁওতালের জমায়েতে ভগীরথ এ শুদ্ধির কথা বলে। এক মিশনারির প্রতিবেদনমতে, যারা এভাবে "শুদ্ধ" হয় নি, তাদের বাউসীর মন্দিরে এবং তালদিহার নতুন সাঁওতালমন্দিরে উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হত না। সাধারণ সাঁওতাল পরিবারের পক্ষে শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু ভগীরথের নির্দেশ বহু জায়গায় মানা হয়।

এ বিষয়ে গোড়ায় সাঁওতালদের কোনো গোপনীয়তা ছিল না।[১৯৬] পরে যখন তারা দেখল, সরকার এটাকে সুনজরে দেখছে না, তারা সতর্ক হয়; লুকিয়ে-চুরিয়ে এসব কাজ চালিয়ে যায়; তবুও থানা-পুলিশের কাছে এ কাজ জানাজানি হয়ে গেলে তারা ওজর-অজুহাত দেখিয়ে নিস্তার পেতে চেষ্টা করে। স্বভাবতই, এ প্রাথমিক উদ্দীপনা পরে খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে আবার তা ফিরে আসে।

'সাফা হোর'দের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন এ নতুন ধর্ম আর নীতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বস্তুত, নতুন বিধিবিধান আর অনুশাসনের কঠোরতার জন্য সাফারা অন্য সাঁওতালদের থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কারণ সব সাঁওতাল নতুন আদর্শে সমানভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারে নি। দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস এবং আচার বর্জন করা অনেকের পক্ষে সহজ ছিল না; কারণ বহুক্ষেত্রে এ বিশ্বাস আর আচার ছিল তাদের সমাজগঠনের মূল বনিয়াদ। তা ছাড়া, বহু জায়গায় কৃষি-উৎপাদনের অনিশ্চয়তার জন্য, শুয়োর-মুরগি না পুষলে তাদের সংসার চালানোই শক্ত হত, বিশেষ করে যখন জমির খাজনা অনবরত বাড়ছিল; আর তাদের দীর্ঘদিনের "অরণ্যের অধিকার" ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল।

সাফারা এসব বুঝতে চায় নি। "ঝুট" সাঁওতালদের সম্পর্কে তাদের অসহিষ্ণুতা এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে।[১৯৭] সাফারা ঝুটাদের তাদের খাবার, বাসনপত্র এবং জল ছুঁতে দিত না; এক কুয়ো থেকে তারা জল তুলত না। সমসাময়িক এক বিবরণ থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণরা ডোমদের যে চোখে দেখে, সাফারা ঝুটাদের সেভাবে দেখত। এমনকী, কোনো-কোনো জায়গায় সাফারা "সাঁওতাল" বা "মাঝি" বলে তাদের উল্লেখ পছন্দ করত না; তারা বলত, তারা "খেরওয়ার, রামহিন্দু খেরওয়ার।" হিন্দুদের তারা সহ্য করত, কিন্তু ঝুটাদের একেবারেই নয়। ধর্মীয় আর সামাজিক অনুষ্ঠানে সাফা আর ঝুটাদের মধ্যে কোনো মেলামেশা ছিল না। কোনো রকম বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল না। লক্ষণীয় এই যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য এবং ব্যবধানের রূপও হিন্দুবর্ণপ্রথার আদলেই গড়ে উঠেছে।

৯১৩

সাঁওতালদের এ সংস্কার আন্দোলন এবং অন্যান্য উপজাতিদের ও সমধর্মী আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।[১৯৮] বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে সবগুলির বিচার সম্ভব নয়। শুধু দুটি ব্যাখ্যার সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

প্রথম ব্যাখ্যা হার্ডিম্যানের[১৯৯]—গুজরাতের এক আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে। দ্বিতীয়টির প্রবক্তা মার্টিন ওরান্স; বিষয়, সাঁওতালদের বিশিষ্ট আন্দোলনটি, যার বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি।

হার্ডিম্যান মনে করেন: সংস্কারের আদর্শ হিসেবে উপজাতিরা যে মূল্যবোধ অনুকরণ করে, তা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মূল্যবোধ; নিম্নবর্গের উপর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় এ মূল্যবোধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে; ব্যাপকভাবে এ মূল্যবোধ গ্রহণ করাতে উপজাতিদের একটা সচেতন লক্ষ্য আছে—এতে এ মূল্যবোধের মাধ্যমে ক্ষমতাবান সম্প্রদায় তাদের প্রভুত্ব কায়েম করার সুযোগ হারাবে।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণীয় কিনা, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এ মূল্যবোধ গ্রহণের লক্ষ্য সম্পর্কে উপজাতিদের নিজস্ব ধারণার উপর। এ সম্পর্কে উপজাতিদের ধারণা সঠিক কী ছিল, অন্তত হার্ডিম্যানের আলোচনা থেকে তা জানা যায় না। সংস্কার-আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সাঁওতালরা স্থানীয় জমিদার, মিশনারি বা প্রশাসনের লোকদের নানা কথা বলেছে। কিন্তু তা হার্ডিম্যানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ওরান্সের আলোচনার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র।[২০০] সভ্যতা আর সংস্কৃতির দিক থেকে ভিন্ন সাঁওতাল ও হিন্দু সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিকাশের রূপ বিশ্লেষণ তিনি করতে চেয়েছেন, বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবের রূপ। এ প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন—কেন একটা বিশেষ সময়ে সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দুদের কোনো-কোনো মূল্যবোধ এবং আচার অনুকরণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

ওরান্সের মতে: "হুলে"র আগেই হিন্দু-সংস্কৃতির কোনো-কোনো দিক সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে। সাঁওতালদের ইতিহাসে হুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শুধুমাত্র কয়েকটা অর্থনৈতিক অভিযোগ দূর করার জন্য তারা হুলে নামে নি; তাদের লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আর গোষ্ঠী হিসেবে পদমর্যাদার উন্নয়ন (rank improvement)। হিন্দুদের থেকে নেওয়া কিছু-কিছু আচার থেকে এ উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়—যেমন উপবীত ধারণ, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে (ritual use) আতপ চাল, তেল, সিঁদুর আর গোবরের ব্যবহার। হুলের সর্বাত্মক ব্যর্থতা এ দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব নানাভাবে তখন বেড়ে যায়। এর একটা প্রধান কারণ, সাঁওতালদের নতুন উপলব্ধি যে সহিংস পথ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উপায়ে তাদের মূল লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। রাজনৈতিক পথ পরিহার করে তারা হিন্দুদের মূল্যবোধ এবং আচার অনুসরণের মধ্য দিয়েই তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হল। হুলের 'ঠিক পরেই' তাই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু, যার মূল লক্ষ্য এ বিশেষ ধরনের উন্নয়ন সাধন। হিন্দুদের মূল্যবোধ গ্রহণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব। এ ধারণার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর অর্থ, সাঁওতালরা মেনে নিয়েছে, হিন্দু-দিখুরা পদমর্যাদায় উন্নততর, আর তারা নিকৃষ্ট। এ মেনে নেওয়াকে ওরান্স বলেছেন rank concession syndrome.

এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। ওরান্স সাঁওতাল সংস্কার-আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যই শুধু আলোচনা করেছেন। এর বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি এমনও বলেছেন, রাজনৈতিক পন্থার বর্জন অপরিহার্য হল বলেই হিন্দু মূল্যবোধের অনুকরণ সাঁওতালদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ মনে হল।

হুলের ব্যর্থতার পর সহিংস উপায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাঁওতালদের অবিশ্বাসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তারা রাজনৈতিক পথকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করল। সংঘবদ্ধ হিংসা নানা রাজনৈতিক পথের অন্যতম মাত্র। রাজনৈতিক পথ সর্বতোভাবে পরিহার করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে সময়কার সাঁওতাল মানসিকতার মূল লক্ষণ এ দৃঢ় প্রত্যয় যে, স্বাধীন সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা না হলে দিখুদের প্রভুত্বের অবসান ঘটবে না। অর্থাৎ, যে দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতালরা তখন দিখুদের সঙ্গে তাদের জটিল সম্পর্কের কথা ভাবছিল, তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। এটা সম্ভবত অনিবার্য ছিল। কারণ, সাঁওতাল সমাজ আর অর্থনীতিতে সংকটের রূপ তখন তীব্রতর হয়েছে; দিখুদের কর্তৃত্ব আরো গভীরভাবে কায়েম হয়েছে।

হিংসার পথ সাঁওতালরা যথাসম্ভব পরিহার করল। কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক পথ সম্পর্কে তারা অনবরত ভেবেছে। শত্রুর উপর যদি সরাসরি আঘাত

হানা সম্ভব না হয়, তাহলে কিভাবে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা যাবে? সাঁওতাল নেতাদের ধারণা ছিল, স্বাধীন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে সংঘবদ্ধ প্রচার করতে হবে; তারা জানুক—এককালে তারা স্বাধীন "মহান জাতি" ছিল; তাদের হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে; বহু সাঁওতালকে যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়, তাহলে দিখুরা পুরনো কায়দায় চলতে সাহস পাবে না; কারণ সংখ্যার দিক থেকে দিখুরা নগণ্য। সাঁওতালদের অতীত ইতিহাসচেতনা জাগ্রত করার একটা উপায় হিসেবে নেতারা সাঁওতালদের পুরনো নাম "খেরওয়ার" কথাটা চালু করে। শুধু সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে দীক্ষিত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। অন্য ধরনের প্রস্তুতিও অপরিহার্য। যেমন, ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনে যা-কিছু গলদ, তা দূর করতে হবে; এক কথায়, ব্যক্তির নৈতিক রূপান্তর এবং নানা ধরনের সামাজিক কু-প্রথার বিলোপের মধ্য দিয়ে একটা নতুন সাঁওতাল সমাজ গড়ে তুলতে হবে। "সংস্কার-আন্দোলনে"র লক্ষ্য তাই শুধু "পদ-মর্যাদার উন্নয়ন" নয়; তা বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির একটা বিশেষ অঙ্গ মাত্র।

ওই সময়কার সাঁওতাল আন্দোলন সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের অনেকেই নতুন সংস্কার আন্দোলন (১৮৭৪-১৮৮২) এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে নিগূঢ় সংযোগের কথা বলেছেন। তাঁদের এ সম্পর্কিত কিছু মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করছি।

স্থানীয় রাজকর্মচারীদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ছোটোলাট টেম্পল এ সিদ্ধান্তে আসেন (৯ মার্চ, ১৮৭৫): 'প্রতিটি সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা প্রধান কারণ থাকে। বর্তমানে ক্ষেত্রে কারণটা হল খাজনা-বিরোধী এক ব্যাপক মানসিকতা'।[২০১]

সাঁওতাল পরগনার কমিশনার বার্লোর[২০২] কাছে, সাঁওতাল আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালে নতুন খাজনার হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য নয়। তাঁর ধারণা (৯ মার্চ, ১৮৭৫): 'শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ভগীরথের আন্দোলন শুরু হয়েছে কি হয় নি, তা আসল কথা নয়; গোড়া থেকেই এর সঙ্গে মিশে ছিল এক ধরনের আপত্তিজনক রাজনৈতিক বোধ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আন্দোলনের শুরুতে ভগীরথ নিজে বা তার নিকট অনুগামীরা বলত, এমন সুদিন আসবে, যখন "রাজ" এবং জমি হবে সাঁওতালদের; সবচাইতে বেশি খাজনার হারও হবে লাঙলপিছু আট আনা মাত্র।' কমিশনারের তাই সিদ্ধান্ত ছিল,[২০৩] যে নতুন সাঁওতাল মন্দিরকে ঘিরে সাঁওতাল সংগঠন গড়ে উঠেছে, তাকে ভেঙে দিতে হবে, এবং তার সাঁওতাল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

এক খ্রীষ্টান মিশনারি কোল (Cole) প্রায় ন বছর যাবৎ সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের ভিত্তিতে লিখছেন—বাইরের প্রকাশ থাকুক বা না থাকুক, "খেরওয়ার" মানসিকতা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো; মাঝে-মাঝেই তাদের নিরুদ্ধ ক্ষোভের 'বিস্ফোরণ ঘটে; অতি সামান্য কারণেই তা ঘটেছে'।[২০৪]

যে উপলক্ষে খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু (১৮৭৪), তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন মহেশপুরের জমিদার গোপালচন্দ্র সিংহ। দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৭৩-৭৪) ধার হিসেবে দেওয়া চালের দাম সরকার যখন আদায় করে নিচ্ছিল, তখন 'ভগীরথ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, এ চালের দাম তারা ফেরত দেবে না; কারণ এ শস্য তাদের পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি; তাদের আদি নিবাসের অঞ্চল থেকে এ চাল আনা হয়েছে।'[২০৫]

খেরওয়ার আন্দোলনের অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে সাঁওতাল মানসিকতায় এক বিশেষ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন পাকুড়ের জমিদার তারেশনাথ পাণ্ডে[২০৬]: 'খেরওয়ার সাঁওতালরা চেষ্টা করে, কী

ভাবে সবচাইতে বেশি রাজনৈতিক সুবিধাদি আদায় করা যায়; তারা বিশেষভাবে চায়, জমিদার বা সরকার কাকেও খাজনা দেবায় দায়দায়িত্ব তাদের থাকবে না; এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হাস্যকর; তারা বলে, জমিদার বা সরকার কেউ তো জমি সৃষ্টি করে নি; জলসেচের কোনো ব্যবস্থা করে নি, বা জমিও চাষ করে নি···খাজনা ইত্যাদি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ব্যবস্থার পর থেকে হিন্দুদের সমান রাজনৈতিক অধিকার পাবার জন্য তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; এমনকী তারা চাইছে, হিন্দুদের তুলনায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার বেশি থাকুক।'

খ্রীষ্টান মিশনারি কোলের ধারণা, খেরওয়ার আন্দোলন 'আসলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের আন্দোলন। [আয়ারল্যাণ্ডের] ফেনিয়ান আন্দোলনের সঙ্গে এর বহু বিষয়ে মিল; ধর্ম এখানে আবরণ মাত্র; খেরওয়ার দল-বহির্ভূত সাঁওতাল এবং [স্থানীয়] খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী-দের মতে, সাফাহোরেরা বলাবলি করে—'জমি আমাদের; আমরা জঙ্গল সাফ করেছি; তাই কোন খাজনা আমরা দেব না; আমরা একজোট হয়ে ইংরেজদের তাড়াব।'[২০৭]

জামতাড়ার আর-এক মিশনারি কর্নেলিয়সেরও ধারণা, খেরওয়ারদের আসল লক্ষ্য, 'সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করা'।[২০৮]

সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনার লক্ষ করেন[২০৯] কিভাবে ধীরে-ধীরে খেরওয়ার আন্দোলনের রূপান্তর ঘটল: 'গোড়ায় খেরওয়ার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ধর্মসম্পর্কিত'। ভগীরথের আমলে 'তা এক রাজনৈতিক রূপ ছিল; আন্দোলনের নতুন শক্তি যোগাল খেরওয়ার স্বর্ণযুগের কল্পকাহিনী; যেখানে তারা পাবে তাদের মনোমত নেতা [শাসক], আর পাবে অপর্যাপ্ত জমি, যার জন্য কোনো খাজনা দিতে হবে না; হুমকি আর শাসানি দেবার জন্য থাকবে না কোনো হাকিম।'

কিভাবে এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খেরওয়ার আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, সাঁওতাল পরগনা-প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কোসেরাট তা ব্যাখ্যা করেন।[২১০] খাজনার হার নিয়ে সাঁওতালরা বরাবর বিক্ষুব্ধ ছিল। ১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় একজোট হয়ে তারা জমিদারের যথেচ্ছ খাজনা বাড়ানোর চেষ্টায় বাধা দেয়। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সরকার ১৮৭২ সালে এক আইন পাশ করে খাজনার নতুন হার ঠিক করার ব্যবস্থা নেয়। বহু জায়গায় ফল হল বিপরীত। সাঁওতালদের অসন্তোষ বেড়েই চলে। কোসেরাট লক্ষ করেন: 'এর ঠিক পরেই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু···আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ···জমি ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যাপক উত্তেজনা আর অসন্তোষ না থাকলে আন্দোলন এত দ্রুত বাড়তে পারত না। খেরওয়ার আন্দোলনের গুপ্ত, পবিত্র [ধর্মীয়] লক্ষ্য কী ছিল জানি না; কিন্তু খোলাখুলি ভাবে রাজকর্মচারীদের কাছে বার-বার তারা যে লক্ষ্যের কথা বলেছে, তা হল এই যে, কোনো ধরনের ট্যাক্সো বা খাজনা তারা আর দেবে না; রাস্তাঘাট সারানোর জন্য তারা বেগার খাটবে না; সাঁওতাল পরগনায় এ ধরনের বেগার খাটা চাষীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক···আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে ভগীরথ বলল, খাজনা ব্যাপারটাই থাকবে না; কিন্তু এ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সাঁওতালদের পুরনো ধর্মকে সম্পূর্ণ ছেড়ে হিন্দুধর্মের সমগোত্রীয় কোনো ধর্মকে গ্রহণ করে হবে।'

এ বিশেষ রাজনৈতিক মেজাজের জন্যই হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস আর আচারের কিছু-কিছু গ্রহণ করলেও সাঁওতালরা মনেপ্রাণে সাঁওতাল থেকে গেছে। বস্তুত, তারা হিন্দু হতে চায় নি; তারা শুধু বিশ্বাস করে-ছিল, হিন্দু মূল্যবোধ গ্রহণের ফলে দিখুদের প্রভুত্বের বদলে সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। সংস্কার-আন্দোলনের ফলে "সাফা" সাঁওতাল ও "ঝুটা" সাঁওতালদের মধ্যে নতুন এক ধরনের সামাজিক বৈষম্য আর ব্যবধানের সৃষ্টি হল। কিন্তু তা হিন্দুজাতিভেদ-

প্রথাপ্রসূত বৈষম্য বা ব্যবধান নয়। এ ব্যবধানের কারণ ঝুটাদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে 'সাফা'দের তীব্র অসহিষ্ণুতা। তাদের ধারণা, ঝুটাদের সংস্কার-বিরোধিতা নতুন সাঁওতালরাজ সৃষ্টির পথে বড়ো এক অন্তরায়। সাফাদের কেউ-কেউ উপবীত ধারণ করেছিল; কিন্তু তাও হিন্দুবর্ণবৈষম্যের প্রতীক নয়; খেরওয়ার নেতারা কেউ কখনও বলে নি যে উপবীত ধারণের অধিকার সবার নেই। সাঁওতাল রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবেগ মন্থর হয়ে এলে বহু সাঁওতাল তাই আবার তাদের আদি ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যায়। তা ছাড়া, সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের নিরন্তর অনু-প্রাণিত করেছিল বলে হিন্দু দিখুদের সম্পর্কে তাদের প্রকাশ্য বৈরিতা কখনও কমেনি। এ বৈরিতা শুধুমাত্র শ্রেণীবোধের ফল নয়; অর্থাৎ যে দিখু গোষ্ঠীদের তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ বলে ভাবত, শুধু তাদের ক্ষেত্রেই এ বৈরিতা সীমাবদ্ধ ছিল না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। ডালটনের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (১৮৭২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[২১১] হিন্দু পাচকের রান্না ভাত সাঁওতালরা কোনোরকমে খেতে রাজি হয়নি; এমন-কী পাচক ব্রাহ্মণ হলেও নয়। অথচ ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সাঁওতালদের এ মনোভাব দেখা যায় নি। অনশনক্লিষ্টদের মধ্যে সরকার তখন যে খাবার বিলিয়েছে, তার সবটাই ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না।

সাঁওতাল মানসিকতার এ জটিলতা, বৈচিত্র্য এবং বহুমুখিতার দিকগুলি উপেক্ষা করলে সাঁওতাল আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণের কাজ অসম্পূর্ণ হবে।

[ক্রমশ

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১৭৫. Bengal Judicial Progs, Feb. 1867, No. 120; Deputy Commissioner, Santal Parganas to the Commissioner, Santal Parganas, 31 Jan, 1867. সহকারী কমিশনার একটা বিশেষ বাজার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন: 'before the Santal Insurrection...there were only 10 or 12 mahajuns and petty traders in the Lohundia Bazar whereas now there are nearly 80, principally Bhojpooria Bhukots [Bhagats] coming from the district of Arrah.'

১৭৬. Bengal Judicial Progs, June 1861, No. 371. সাঁওতাল পরগনার অস্থায়ী কমিশনারের চিঠির (২৪ মে, ১৮৬১) Para 17.

১৭৭. Bengal Judicial Progs, May 1861, No. 524; Taylor, Assistant Commissioner, Santal Parganas to the Govt. of Bengal, 5 May, 1861. টেলর লিখেছেন, কানুর ফাঁসির আগের দিন সে নাকি টেলরকে এ কথা বলেছে; সাঁওতালরা নাকি তার এ কথা শুনেছে। টেলরের বিশ্বাস, কানুর এ ভবিষ্যদ্বাণী সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে।

১৭৮. Bengal Judicial Proceedings, July 1865, No. 72; Wilmot, Assistant Commissioner, Santal Parganas to Commissioner, Santal Parganas, 17 June, 1865.

১৭৯. Bengal Judicial Progs, July 1871, No. 163; Raja of Moheshpur to Deputy Commissioner, Santal Parganas, 3 July, 1871.

১৮০. Bengal Judicial Progs, July 1871, No. 165; Govt. of Bengal to the Govt. of India, 11 July 1871, Para 3.

১৮১. Bengal General (Misc) Proceedings, Sept 1875, File No. 133—1/4. Bhagalpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1874-75; Para 76.

১৮২. Bengal Judicial Progs, Nov. 1874, Nos. 1-3; Boxwell, Offg. Dy. Commissioner, Santal Parganas to the Commissioner, Santal Parganas, 1 Oct, 1874; Para. 19.

১৮৩. একই; The Rev. A. Stark, Church Missionary, to Barlow, Commissioner of the Bhagalpur Division, 2 Sept. 1874.

১৮৪. একই।

১৮৫. Bengal Judicial Progs, Aug. 1881; Nos. 39-40. Reply from the Rev. F. F. Cole, of Bahawa in Rajmahal, Church Missionary Society to Question No. 7: 'What is the origin of the Kherwar movement... ?'

১৮৫ক. একই; Reply from the Rev. A. stark of Taljhari in Rajmahal, Church Missionary Society: to Question No. 5: "What do you think was the cause of the opposition to the Census,..." ?

১৮৬. একই; Barlow, Commissioner of the Bhagalpur Division to the Govt. of Bengal, Judicial Dept. 8 June, 1881; Para 12.

১৮৭. একই; Appendix A: 'Note by the Deputy Commissioner of the Sonthal Pargans: 'State of Affairs in the Santhal Parganas'. 16 March, 1881.

১৮৮. একই; সহকারী কমিশনার Oldham-এর ভাষায়: 'the Sonthals appeared to be shy, gloomy, and either anxious or expectant...'; Para 6.

১৮৯ একই; যে মিশনারির কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাঁর নাম Cornelius, Jamtara outpost, Para 8.

১৯০. একই; Reply from Baboo Taresh Nath Pandey, Zemindar of Pakour to Question No. 7. (পাদটীকা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য): পাণ্ডের মন্তব্য: 'It was some seven or eight years ago that some of the ordinary Sonthals, struck with the disparity between theiro wn status and that of the Hindus about them, who were showing signs of life and improvement in every direction, were fired with a desire of bettering then own social and religious condition as preliminary to joining political rights'.

১৯০ক. একই; Appendix C; Reply from Captain Carnac, Assistant Commissioner, S. P.; Answer to Question No. 8. Carnac-এর মন্তব্য: 'their [Santals'] inferiority to their neighbours must have been felt amongst them...the term 'Banga Sonthal' 'Boka Sonthals', so frequeutly used towards them by their Hindu neighbours, must have been very galling.'

১৯১. পাদটীকা নং ১৮১ দ্রষ্টব্য

১৯২. একই। এর নাম মাতাদিন। কমিশনার তাকে 'ex-mutineer of a cavalry regiment' বলে উল্লেখ করেছেন। ভাগলপুর জেলেই নাকি ভগীরথের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হয়। ১৮৬৮ সাল থেকে তাদের এ ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত থাকে। ভগীরথ-আন্দোলনের সময় বিদ্রোহী সিপাহি মাতাদিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কোনো ইঙ্গিত সরকারি দলিলে মেলে না।

১৯২ক. আদমশুমারি-বিরোধী আন্দোলনে মঙ্গল দাসের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

১৯৩. পাদটীকা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার খেরওয়ার আন্দোলন সম্পর্কিত বারোটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য জমিদার, মিশনারি, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রাজকর্মচারীদের কাছে পাঠান।

১৯৪. Bengal Judicial Proceedings, March 1875, File No. 40-88. A Note of G. N. Barlow, Bhagalpur Commissioner, 'upon the course of events occurring in the Santal Perguanahs subsequent to 1872, which have led to the state of affairs at the present time; date 9 March 1875; Para 8.

১৯৪খ. এ ধরনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। সাফারা ভগবানের একত্বের কথা বলত; কিন্তু হিন্দুদের নানা দেবদেবীর পুজোও করত (যেমন দুর্গা, কালী)। পুজাঅনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ঘি, দুধ এবং চালের ব্যবহার নানা জায়গায় দেখা গেছে। রুদ্রাক্ষের ('sacred beads') মালাও অনেকে পরত। কেউ-কেউ মাথায় টিকি রাখত। বৈষ্ণব গোসাঁইদের মতো অনেকে লম্বা চুল বা দাড়ি রাখত; তাদের মতো বিশিষ্ট কায়দায় কাপড় পরত। সাফারা সাধারণত হাঁড়িয়া খেত না, কিন্তু তাদের গাঁজায় আসক্তির কথা অনেকেই বলেছে। এও সম্ভবত 'বাবাজী'দের প্রভাবের ফল। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে তারা হিন্দুদের মতো মাটির বাসনপত্র ভেঙে ফেলে দিত। তারা শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলেছে। কিন্তু পায়রা, ছাগল এবং ভেড়া পোষাটা তাদের কাছে শুদ্ধাচারবিরোধী মনে

হয় নি। চাষের জন্য গোরু-টানা হালের ব্যবহারে অনেক সাফার আপত্তি ছিল। পোশাকে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন—ল্যাংগুটির বদলে ধুতির ব্যবহার।

১৯৫. (১) Bengal Judicial Proceedings, Nov. 1874, Nos. 1-3; ভাগলপুর কমিশনার বার্লোর চিঠি (৭ অকটোবর, ১৮৭৪); Paras 6-7; (২) তাছাড়া, Bengal Judicial Proceedings, March, 1875, File 40-88; A Note by the Bhagalpur Commissioner, 9 March, 1875; Paras 3 & 8.

১৯৬. পাদটীকা নং ১৯৫(১) দ্রষ্টব্য। Letter from, Boxwell, offg. Deputy Commissioner, Santal Parganas, 1 Oct., 1874 Para 11.

১৯৭. শুয়োর-মুরগি মারার ব্যাপারে গুরুর নির্দেশ পালনে কোনো শিথিলতা সাফারা বরদাস্ত করে নি। এ সম্পর্কে এক সরকারি রিপোর্টে বিবৃত একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনার ক্যাপ্টেন Carnac লিখেছেন: 'I have known a kherwar in a fit of anger at the uncleanliness of a neighbour Santhal run amok in his poultry yard and kill three or four fowls before he could be stopped'. Bengal Judicial Proceedings, Aug. 1881, Nos. 39 40; Appendix C; ভাগলপুর কমিশনারের ছয় নং প্রশ্নের উত্তর। সাফা ও ঝুটাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে তথ্যের জন্য ভাগলপুর কমিশনার প্রেরিত ৬-৮ নং প্রশ্নের নানা উত্তর দ্রষ্টব্য। মূলসূত্র একই; Appendix B.

১৯৮. দক্ষিণ গুজরাতের দেবী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ ধরনের কয়েকটা ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন: David Hardiman, Adivasi Assertion in South Gujarat: the Devi Movement of 1922-23, in R. Guha (ed): Subalterm Studies, III, (O.U.P., 1984), পৃ ২১১-২১৭। বিস্তৃত আলোচনার জন্য, D. Hardiman, *The Coming of the Devi; Adivasi Assertion in Western India* (O.U.P., 1987); Ch.: 9.

১৯৯. David Hardiman, পূর্বোল্লেখিত; 'Adivasi Assertion' in South Gujarat etc, পৃ ২১৭-২১৯

২০০. Martin Orans, *The Santal: A Trtbe in Search of a Great Tradition.* (Wayne State University, Detroit, 1965, পৃ ৩০-৩৯

২০১. পাদটীকা নং ১৯৫ ২) দ্রষ্টব্য; File No. 40-89; Minute by the Lieutenant Governor of Bengal, 9 March, 1875; Para 3

২০২. একই; File No. 40-88; A Note by G. N. Barlow, Commissioner of the Bhagalpur Division, 9 March 1875; Para 7. কমিশনারের মতে, খাজনা বিরোধী আন্দোলন এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে নিগূঢ় সংযোগ এ ক্ষেত্রে 'অনিবার্য'।

২০৩. পাদটীকা নং ১৮১ দ্রষ্টব্য। কমিশনারের নির্দেশ ছিল, মন্দিরটাকে ভেঙে এক পুলিশ ফাঁড়ি বানানো হোক। আসলে সত্যিকারের সম্পূর্ণ মন্দির ছিল না। কমিশনার জানতে পারেন: '...the Shrine was represented by a mere shed containing a few rough stones'। পাদটীকা নং ২০২ দ্রষ্টব্য। কমিশনারের চিঠির (৯ মার্চ, ১৮৭৫) Para 4.

২০৪. Bengal Judicial Proceedings, Aug. 1881, Nos. 39-40; Appendix B, ভাগলপুর কমিশনারের ৭ নং প্রশ্নের উত্তর। Cole লিখছেন: 'Kherwarism has periodical outbursts; the least thing causes it to burst forth'.

২০৫. একই; ৭নং প্রশ্নের উত্তর

২০৬. একই; পাণ্ডের সিদ্ধান্ত: '...now they [kherwars] are a religious sect no less than a political body bound up by a strong unity, and holding themselves quite aloof from the non-kherwars in every branch of occupation and in all their social and religious dealings'.

২০৭. একই

২০৮. একই

২০৯. একই; Appendix C; ভাগলপুর কমিশনারের ৮নং প্রশ্নের উত্তর

২১০. একই; Appendix C.

২১১. *Descriptive Ethnoiogy of Bengal* (Calcutta 1872)-এ উল্লেখিত Dalton-এর এ অভিজ্ঞতার বর্ণনা Marten Orans উদ্ধৃত করেছেন। পাদটীকা নং ২০০ দ্রষ্টব্য; পৃ ৩৭

কেন সাজাও

কিরণশঙ্কর মৈত্র

কলাবতী, আমাকে সাজাও কেন এমন বসন-ভূষণে
শরীরে জড়িয়ে দাও আরামের ললিত আলো,
নিদাঘের শুকনো বাতাস হানে কঠিন ঝাপটা—
কমললতা, কেন সাজাও এমন রেশম আবরণে।

স্বর্ণলতা, আমার শরীরে দিয়ো না সোনার গন্ধ,
সুবর্ণরেখা বয়ে যাক পায়ের তলায় ঝিরিঝিরি—
কোমরে জেগে থাক অলৌকিক জ্যোছনা তোমার,
ছিনতাই ঘরের বাইরে, নীলাঞ্জনা, দিয়ো না সোনার ঝলক।

মাধবীমালা, চুলে লাগিয়ো না সযতনে ময়ূরপালক
উদাসীন আকাশ, ঈগলের ধারালো নখ ও চঞ্চু,
আমাকে পাঠিয়ো না খোলা বাজারে, সওদার—
কেড়ে নেবে সময় ও সুগন্ধ, রণক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ-একক।

শুধু আস্তিনে জড়িয়ে দিয়ো ভালোবাসা—বকুল-গন্ধ,
কামিজে অপ্রতিম চুম্বন-চিহ্ন—উথাল-পাথাল,
পদতলে কতো সুবর্ণময় সিঁড়ি নতজানু; এসো,
দীঘির জলে ভাসাই ছোটো-ছোটো সুখ-দুঃখ, স্মৃতির-প্রদীপ।

ভাসান

দেবী রায়

মন যতো-ই উর্ধ্বগামী আগুন-পারা হুহু, তুমি কি ভাব
সবিশেষ একজন কেউ, পরনে তন্তুজ শিথিল কবরী ধীর পায়ে
সটান নেমে এসে খুলে দেবে দক্ষিণের রুদ্ধ-দরোজা? 'যাবো—'

ভাবছিলাম, শুধু সেই আহ্বানের অপেক্ষায়, ছিলামও গা বাঁচিয়ে
এতকাল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর করে উঁকি-মেরে কখনো বা লক্ষ করেছিলাম:
ওই ডাঁশা-পেয়ারা, ডালে ঝুলছিল ডাগর গৃধ্র চকচকে চোখ এড়িয়ে

সহসা মেঘ ঝুঁকে পড়ে···ত্যাখে: গাছ নয়—জলাশয়ে···শুঙ্গাটক, দাম
বহোৎ। অ-সময়ের ফল, যে কেউ ঠোকরাতে পারে···সরীসৃপ কিলবিলে
জলজ শিকড়ের আশপাশে ছোঁক-ছোঁক করে শ্যাওলা, শুধোয়: 'এলে'

তাহলে সেই তুমি-য়ো, কালামুখো? অলিগলি ছেড়ে, এ-তদূর? জানমান
সম্বল, ভিতরে কী এক অস্থির-গোঙানি···ছিপি-আঁটা নেশা মুশকিল আসান
সব? কে তাকে কাঁদায় অহোরাত্র?···কাউকে বলা যায়?
বুকের ভিতরে কার নিরবধি ভাসান!

পুরোনো শব্দ

অজয় নাগ

এক-একটা শব্দের অভিমান আমাকে স্পর্শ করে
ছেলেবেলায় যে শব্দ আমার সঙ্গী ছিল
তার মুখ মনে পড়ে কখনো বা—
যেমন হঠাৎ একা ঘরে অন্য এক আমাকে দেখতে পাই
তেমনি কোনো শব্দের চন্দনস্মৃতি
আমাকে পিছন দিকে ডাকে—

একদিন পথের ঘূর্ণি-হাওয়ায় পোশাক উড়ে যায়—
আমার নামের অক্ষর নির্জন হয়ে পড়ে···
আমি তখনই হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুকে পাই
এবং ঝুমকোফুলের একঝলক
পুরোনো শব্দের এক-বুক ঘ্রাণ
লাজুক চোখে আমার দিকে চেয়ে হাসে—হাসতে থাকে

পৃথিবী যখন হিরোশিমা

হোসাইন কবির

কোথাও মৃত্তিকা নেই
মৃত্তিকা : কঠিন শিলা
মানুষ ও পাখির চোখ স্থির
হৃদয়ে টুংটাং ধাতব শব্দ

কোথাও জল নেই
মসৃণ পাথরের আস্তরণে
স্থির : জলজ উদ্ভিদ ও মাছের সংসার

শ্যামল-অরণ্য নেই ফুল নেই পাখি নেই
নেই কেউ দাঁড়িয়ে কোথাও
শুধু ধাতব শব্দে
লালরঙ রোদের মতো জ্বলছে মৃত্তিকার সংসার

মৃত্তিকা গর্ভবতী হলেই
রঙ বদলায় ফুল পাখি নারীর
আর পৃথিবীর জৈবিক অট্টালিকায়
জেগে থাকে চাঁদ—সারা রাত

কোথাও তো মৃত্তিকা নেই
ফুল পাখি নারী
লালরঙ পাথর হয়ে জ্বলছে মৃত্তিকার সংসারে।

বাংলাদেশ

বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

৪ঃ অজানার অভিযান

হঠাৎ আমার জীবনে এল এক বিরাট শূন্যতা, আর তার সঙ্গে এল তুমুল আলোড়ন। বৈপ্লবিক গবেষণা ক্ষান্ত হল, অধ্যয়নও রাতারাতি অবান্তর হয়ে দাঁড়াল। পদে-পদে মনে হত শিবদার কথা, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে হত, আমিও তো ছিলাম সাধুর কাছে বাগদত্ত, বড়দার অনুপস্থিতিতে মা-র বিহ্বলতার দিনে। মাথায় ঘুরতে লাগল আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ; সন্ন্যাসধর্ম আর দেশসেবা বা জনসেবার আদর্শ—এ দুয়ের মধ্যে কল্পনায় মনে হল কোনো অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ নেই, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা অসম্ভব হবে না, এবং তা নির্ভর করবে নিজের উপর। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব আর ধাঁধার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। সেই অন্তর্দাহ হতে ধীরে-ধীরে দেখা দিল সংকল্প; অচিরে তা দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হল।

বোধহয় তখন ছিল ফাল্গুন মাস। ভোরের আলোর আভাস তখনো দেখা দেয় নি। চারিদিক নিঝুম, সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চুপিচুপি উঠে আমার বিছানা পরিপাটি করে ভাঁজ করে তুলে রাখলাম রোজকার মতো, তারপর একটি ছোটো পুঁটলি হাতে বেরিয়ে পড়লাম—মনে-মনে সবার আশীর্বাদ নিয়ে। শুরু হল আমার জীবনে নতুন অধ্যায়, অজানার অভিমুখে অভিযান; বিদ্রোহ নয়, আত্মনিগ্রহের পালা।

অন্ধকারে গলির রাস্তা ধরে মাইল খানেক হেঁটে পৌঁছলাম কুমিল্লা রেল স্টেশনে, তারপর রেললাইন ধরে হাঁটা শুরু করলাম। আমার গন্তব্য স্থান ছিল চাঁদপুর—৪৬ মাইল দূরে। ঠিক করেছিলাম, সারা দিন হেঁটে সন্ধ্যা নাগাদ চাঁদপুরে পৌঁছব। ওখান থেকে গোয়ালন্দের জাহাজ ছাড়ত রাত আটটা-নটা নাগাদ। তাই সারাটা দিন আমার হাতে ছিল। হেঁটে গেলে খরচ কম, সে কথাও অবশ্যি ভুলি নি। তা ছাড়া, গৃহত্যাগী পরিব্রাজকের নতুন জীবনের সূচনায় দীর্ঘ পথ পায়ে চলাই সমীচীন বলে মনে হয়েছিল।

সেদিন চল্লিশ মাইলের উপর হেঁটেছিলাম। মনে পড়ে রেলের পুলগুলির উপর দিয়ে যেতে কিছু ভয় হচ্ছিল, পা কাঁপছিল। তাই অতি সন্তর্পণে পার হয়েছিলাম। দুবার দুটি ছোটো-ছোটো স্টেশনে থেমে সামান্য টিফিন করেছিলাম। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল তখনো চাঁদপুরে পৌঁছবার একটি স্টেশন বাকি ছিল, পা দুটিও মৃদু প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিল, তাই চাঁদপুরের আগের স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাকি পাঁচ-ছ মাইল ট্রেনে করে গেলাম। যথাসময়ে জাহাজ ধরে গোয়ালন্দ হয়ে শিয়ালদা একসপ্রেস ধরে কলকাতা গিয়ে হাজির হলাম পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ।

শিয়ালদা থেকে হেঁটে চলে গেলাম মহানির্বাণ মঠে। তখন পথ এত সুগম ছিল না, বিশেষ করে ভবানীপুর অঞ্চলে অনেক অলিগলির ভিতর দিয়ে যেতে হত। তবে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় নি, কারণ কাকা বছর তিনেক আগে, সম্ভবত ১৯১৭ সনে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই মঠে গিয়েছিলেন। তখন ওই মঠে দিন তিনেক ছিলাম, সে এলাকার পথঘাটও আমার অনেকটা চেনা ছিল। আর সাধুদের অন্তত আট-দশ জন আমাকে ভালো করে চিনতেন। আমাকে দেখে তাঁরা বেশ খুশি হলেন।

গুরু শ্যামসুন্দরানন্দ আমার আগমনে বিস্মিত হন নি। বোধহয় ধরেই নিয়েছিলেন যে আমি অদূর ভবিষ্যতে আশ্রমে এসে হাজির হব, বিশেষ করে শিবদার সংসারত্যাগের পর। গুরু সবেমাত্র নিজের আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলেন—নবদ্বীপ থেকে পাঁচমাইল দূরে মাধাইপুর গ্রামে, আনুমানিক পঞ্চাশ বিঘে জমি কিনে। তাই শিবদা এবং আরও দুই জন শিষ্য নিয়ে কলকাতায় মঠ ছেড়ে ওখানে চলে গিয়েছিলেন। আমার জন্য ব্যবস্থা হল—প্রথম মাস-তিনেক কলকাতায় থাকব, আশ্রমের নানা কাজে সাহায্য করব, তারপরে মাধাইপুরে গুরুর নতুন আশ্রমে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেব।

সাধুসেবা ও গোলাপঠাকুন

আমার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হল সাধুসেবা দিয়ে। তখন ওখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী থাকতেন। তা ছাড়া, রোজই নানা জায়গা থেকে শিষ্যরা এসে কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতেন। ফলে আশ্রমে একটি বেশ বড়ো রকমের সংসার চালাতে হত। সাধুর সংসারেও নিতান্ত মামুলি কাজের প্রয়োজন কিছু কম ছিল না।

আমাকে করা হল রান্নাঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট্। তার সঙ্গে এল ভাঁড়ারের ভার। রোজ সকালে বিকেলে দুবার করে চালডাল, আটা-ময়দা, তেল-ঘি, মসলা ইত্যাদি সব ওজন করে বার করে দিতে হত। জিনিসের তালিকা আসত গোলাপঠাকরুনের কাছ থেকে। তাঁর উপরে ছিল রান্নাঘরের সব দায়িত্ব। আশ্রমের যাবতীয় রান্না তিনি একা নিজের হাতে করতেন। তাঁকে রান্নাঘরে নানা কাজে সাহায্য করার ভারও পড়ল আমার ওপর।

সেই মঠের কথা যখন ভাবি তখন সবার আগে মনে পড়ে গোলাপঠাকরুনের কথা। তাঁর ছবি আজও চোখের সামনে ভাসে। তিনি ছিলেন বিধবা সন্ন্যাসিনী, আয়তনে দীর্ঘ, স্থূলকায়া। তাঁর পরিচ্ছদ ছিল হালকা হলদে রঙের শাড়ি। গায়ের রঙ ছিল ধবধবে ফরসা, মাথায় চুল ছিল প্রচুর—সাদাকালোয় মেশানো। মুখের উপর সব সময়েই ছিল অকৃত্রিম লাবণ্য। তাঁর দৃষ্টিতে মনে হত যেন জড়ানো রয়েছে ধ্যান, স্নেহ আর করুণা। তিনি স্বভাবতই ছিলেন স্বল্প- ও মিষ্টভাষী। তাঁর লাবণ্যময় গৌরবর্ণ আর কোমল স্বভাবের জন্যই বোধহয় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল গোলাপঠাকরুন। তাঁর কর্মকুশলতা ছিল অসাধারণ। এই স্নেহশীলা মাতৃতুল্যা সন্ন্যাসিনী মনে হল যেন কয়েক দিনের মধ্যেই আমার মায়ের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন।

তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন, নিজ হাতে অনেক কাজ শিখিয়েছিলেন—আলুর খোসা ছাড়ানো,

তরকারি কোটা, আটা মাখা, চাকি-বেলুন দিয়ে রুটি বেলা, আর রোজ সকালে আশ্রমের ছোটো পুকুরে একগাদা বাসন মাজা। আমার শিখবার আগ্রহ আর তৎপরতা দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। আবার মাঝে-মাঝে আপন মনে খানিকটা দুঃখও প্রকাশ করতেন। আমি যে সংসার ছেড়ে এসেছি, এজন্য তিনি বেদনা বোধ করতেন। মুখে না বললেও বুঝতে পারতাম, তাঁর মতে গুরু এভাবে আমাকে সংসার থেকে ছিনিয়ে এনে ভালো কাজ করেন নি। তাঁর মনে-মনে কামনা আর প্রার্থনা ছিল যেন আমি শীঘ্রই আবার বাড়ি ফিরে যাই।

সকাল ছটা হতে রাত দশটা অবধি আমার কাজের অন্ত ছিল না। উপাসনার সময় অবশ্য মন্দিরে উপস্থিত থাকতাম সব সাধুদের মতো। সুযোগ পেলে এক ফাঁকে দিনের বেলা কোথাও একটু ঘুমিয়ে নিতাম। তখন গরম কাল, তাই জামাকাপড় বা বিছানার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। মনে পড়ে, অনেক রাত কাটিয়েছি মন্দিরের পশ্চিম দরজায় মার্বেলের উপর একটি গামছা পেতে বালিশ ছাড়া শুয়ে। কোনো কষ্ট বোধ করি নি।

সকালবেলায় বাসন মাজায় আমার প্রায় এক-ঘণ্টা কেটে যেত। কড়াই, সসপ্যান ইত্যাদি ঝামা দিয়ে ঘসে পরিষ্কার করতে হত। পেতল-তামার জিনিস একটু তেঁতুল লাগিয়ে মেজে ঝকঝকে করে তুলতাম। দেখে সবাই খুশি হতেন, বিশেষ করে গোলাপঠাকুর।

তারপর ভাঁড়ারের জিনিস ফর্দমতো ওজন করে বার করে দিয়ে বসতাম একগাদা তরকারি নিয়ে। গোলাপঠাকুর চটপট সব কুটে নিতেন। তাঁর পাশে বসে আরেকটা বড়ো বঁটদা নিয়ে নিজে তাঁর দেখে-দেখে আলু, বেগুন, ফুলকফি, বাঁধাকফি ইত্যাদি কাটবার চেষ্টা করতাম। আমার সতর্ক মন্থর গতি দেখে তিনি মুচকি-মুচকি হাসতেন, বিশেষ করে আলুর খোসার সঙ্গে অনেকটা আলু চলে যেত বলে। তবে আমাকে হপ্তা ছয়ের বেশি অ্যাপ্রেনটিস থাকতে হয় নি। সব তরকারি তারপর একা নিজেই কুটে দিতাম। তার মধ্যে থাকত সের আড়াই আলু। বড়ো বঁটিতে বসে ঠিক গোলাপঠাকুরুনের মতো আলুর খোসা ছাড়ানো তখন আমার অত কঠিন মনে হত না। এমনকী আমার দক্ষতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একদিন উনি হেসে আমাকে বললেন, 'বাবা, আলুর খোসাতে আরেকটু বেশি আলু রেখো। ঠাকুরের ভোগের জন্য পাঁচ পদ রান্না করতে হয়। তার মধ্যে একটি হল চচ্চড়ি, তাতে সব সময়েই আলুর খোসাগুলি দিই।'

বিকেলবেলা ভাঁড়ার থেকে রাত্তিরের রান্নার জন্য আবার সব মালমসলা মেপে বার করে দিতাম। সন্ধে-বেলা মন্দিরে আরতি হয়ে যাবার পর রান্নাঘরে এসে গোলাপঠাকুরুনের কাজ দেখতাম, আমার সাধ্যমতো সাহায্য করতাম। রোজই আড়াই সেরের মতো আটার হাত-রুটি করা হত। আটাতে ময়ান দিয়ে মাপমতো জল দিয়ে মেখে দেওয়া কঠিন ছিল না। তা সহজেই শিখে নিয়েছিলাম। ঠিকমতো লেচি বানানোও কঠিন মনে হয় নি। কিন্তু চাকিবেলুন দিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে রুটি বেলা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল। গোলাপঠাকুরুন ডাল, তরকারি ইত্যাদি রান্না করতেন, আর আমি বসে-বসে চাকিবেলুন নিয়ে লড়াই করতাম, রুটি কিছুতেই ঠিকমতো বেলা হত না। সমানভাবে গোল না হয়ে বিকৃত হয়ে যেত। তিনি দেখে সস্নেহ হাসি হাসতেন আর আর আমাকে সব সময়েই উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'তুমি শীগগিরই ঠিক করে বেলতে পারবে, বাবা। কিচ্ছু ভেবো না।'

সব রান্না শেষ হলে তিনি রুটিতে হাত দিতেন। আমার বেলা নানা প্যাটার্নের তিন-চারটি রুটি আবার লেচি করে নিমেষে বেলে নিতেন। সব নিখুঁতভাবে গোল হত। তাঁর রুটি-বানানো দেখবার জিনিস ছিল। কয়লার উনুনে ছোটো তাওয়ায় একটির পর একটি রুটি চাপিয়ে নিপুণভাবে ওলট-পালট করে একসঙ্গে

চারটি রুটি সেঁকে নিতেন। তারপর একটি-একটি করে লোহার ফাঁকা হাতা দিয়ে উনুনের ওপর ধরতেন, আর এক মুহূর্তে প্রত্যেকটি রুটি প্রায় বেলুনের মতো ফুলে উঠত। তার উপর খানিকটা ঘি ছড়িয়ে তুলে রেখে আবার চারটি লেচি বেলে নিতেন।

আমার মাথায় ঢুকল, তাঁর চারটি রুটি সেঁকার সময়ের মধ্যেই আর-চারটি রুটি বেলে দিতে পারি কিনা। গোড়ায় ছটোর বেশি পারি নি, তারপরে তিনটে, মাসখানেক পরে দেখলাম চারটেই বেলে দিতে পারি ঠিকভাবে, একই সময়ের মধ্যে। মনে হল যেন মস্ত বড়ো পরীক্ষা পাশ করলাম। গোলাপঠাকুরুন আমার কৃতিত্বে মুগ্ধ হলেন।

মাঝে-মাঝে আশ্রমে বড়ো রকমের উৎসব হত। তখন বাইরে থেকে লোক এনে খিচুড়ি, লাবড়া, বেগুনভাজা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি রান্না করা হত। আমি মন দিয়ে সেসব দেখেছি। চার-পাঁচ ফুট লম্বা হাতা নিয়ে মস্ত বড়ো গামলাতে নিজেও কিছু নাড়াচাড়া করেছি। উৎসবের সময় ভক্তরা দলে-দলে এসে প্রসাদ গ্রহণ করে যেতেন। সে দিনগুলো এলে আশ্রমে বেশ হইচই পড়ে যেত। মনে হত সাধুরাও যেন বেশ উৎসুকভাবে সে দিনগুলোর প্রতীক্ষায় থাকতেন।

কাজের ঘূর্ণিপাকে আমার তিন মাস বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেল। এবার গুরুর কাছ থেকে আদেশ এল মাধাইপুর যাবার। গোলাপঠাকুরুনের কাছ থেকে মন সহজে বিদায় নিতে চায় নি। নিজেকে বোঝালাম, যে পথ বাছাই করে নিয়েছি সেখানে তো এজাতীয় মমতার স্থান নেই। তা ছাড়া, নিজের ঘরবাড়ি আপনজন ছেড়ে এসেছি, এই আশ্রমের সংসার ছেড়ে যেতে আপত্তি করলে চলবে কেন? গোলাপঠাকুরুনকে প্রণাম করলাম। তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ আর সকরুণ বাষ্পাকুল দৃষ্টি আজও ভুলতে পারি নি। আমি জানি তিনি মনে-মনে কী চেয়েছিলেন—যেন গুরুর নতুন আশ্রমে না গিয়ে নিজের পুরোনো বাড়িতে ফিরে যাই।

৫ : আশ্রমের কারাগারে

কলকাতা থেকে কী করে মাধাইপুরে গিয়েছিলাম এখন আর সঠিক মনে পড়ে না। মনে হয়, গুরু নিজেই একবার কলকাতায় এসেছিলেন, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে যেতে হত হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে নবদ্বীপ স্টেশনে, তারপর ওখান থেকে পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে রেললাইন ধরে মাঠের পাশ দিয়ে, কারণ সে অঞ্চলে তখন কোনো ভালো রাস্তা ছিল না। বলা বাহুল্য, সেসব জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর কথা কেউ তখন ভাবতেও পারে নি। তাই সন্ধে হয়ে গেলে কেরোসিনের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেই সব কাজ করতে হত।

আমরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে আসছিল। অল্প পরেই চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল। সবার জন্যেই সামান্য কিছু আহারের ব্যবস্থা হল, তারপরেই এল শোবার সময়। তখনও হয়তো নটা বাজে নি, তবু চারদিক একেবারে নিঝুম। মনে হল আমিও যেন অতল অন্ধকারে ডুব দিলাম। গভীর ঘুমে সারা রাত কেটে গেল।

এবার শিবদাকে দেখলাম একেবারে রূপান্তরিত অবস্থায়—মুণ্ডিতমস্তক, পরনে গেরুয়া, কাছাকোচা-হীন, লুঙ্গির মতো করে পরা। তাঁর নতুন নাম হল সত্যানন্দ। বুঝলাম, সন্ন্যাসধর্মে তাঁর দীক্ষা বেশ দ্রুত গতিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। গুরু বোধহয় ভেবেছিলেন 'শুভস্য শীঘ্রম্', অন্তত এ ক্ষেত্রে। আর দুই গুরুভাইয়ের নাম পরমানন্দ (ডাকনাম—শচীন) ও চিদানন্দ (ডাকনাম—শিশু)। শচীন আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন। উনি গৈরিক ধারণ করেছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে। গুরু তাঁকে অনেকটা নিজের অ্যাসিসট্যান্ট বলে মনে করতেন আর সেইভাবে তাঁকে কাজের ভার দিতেন।

শিবদা আমাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন, আমিও তাই। তাঁর কাছ থেকে এই সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের

দৈনন্দিন কাজ জেনে নিলাম। তারপর গুরুর নির্দেশ-মতো সেখানকার কাজে যথাসাধ্য তৎপরতার সঙ্গে যোগ দিলাম। এবার অযাচিতভাবে শুরু হল আমার এক অভিনব বন্দীজীবন আর তার সঙ্গে-সঙ্গে এক নিষ্ঠুর আত্মনিষ্পেষন।

গুরু বাছাই করে নিয়েছিলেন একটা পতিত জমি। তখনকার দিনে তার দাম ছিল নিশ্চয়ই যৎসামান্য। ভেবে দেখলে মনে হয়, অনেক সাধুর মতো রিয়ল এসটেটের দিকে আমাদের গুরুরও বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পোড়ো জায়গায় আশ্রম গড়ে তুললে ধীরে-ধীরে তার মূল্যবৃদ্ধি হবে, ফলে তা নিছক আধ্যাত্মিক ভাবে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও ফলপ্রসূ হবে, সে সম্বন্ধে অনেক সময়েই তাঁদের বেশ টনটনে খেয়াল থাকে। সংসারত্যাগী এই সন্ন্যাসীর সাংসারিক বুদ্ধি কত প্রখর ছিল, তা তাঁর সান্নিধ্যে থেকে, তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা দেখে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে-ছিলাম আর মর্মাহত হয়েছিলাম।

জায়গাটা ছিল মস্ত বড়ো খোলা মাঠের মতো। তার উপরের স্তরে মাটির চেয়ে বালির মাত্রাই ছিল বেশি। তার নীচে ছিল প্রায় পাথরের মতো শক্ত জমি। সবুজের চিহ্ন ছিল বিরল। এখানে-সেখানে কিছু দুর্বাঘাস দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তারা বহু কষ্টে নিজের সবুজত্ব রক্ষা করে চলেছে। দূরে নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি পদ্ম পলাশগাছ, পতিত জমির প্রকৃতিদত্ত মলিনত্ব জাহির করে। আর দূরে, মাঠের এক কোণে ছিল দুটি আধমরা খেজুরগাছ, তাদের গায়ে ঝুলছিল তিন-চারটে ছোটো শুকনো আধপাকা খেজুরের গোছা।

বেলা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই গরম ধা-ধা করে বেড়ে যেত। আকাশ ধবধবে সাদা, মাঠে খাঁ-খাঁ করে রোদ, কোথাও মেঘের আভাসমাত্র ছিল না। কারণ তখন সেখানে গ্রীষ্ম চলেছিল পুরোদমে।

সবশুদ্ধ তিনটে ঘর তখন তৈরি করা হয়েছিল, মাটির ভিটি, বাঁশের বেড়া আর খড়ের চাল দিয়ে। একটা ঘর একটু বড়ো ছিল, সেখানে গুরুর গুরু নিত্যানন্দ ঠাকুরের ছবি বসানো ছিল। সেটাই ছিল তখনকার মন্দির বা ঠাকুরঘর; আরতি, উপাসনা, ভজন, কীর্তন—সব-কিছু ওখানেই হত। গুরু নিজে ওখানেই থাকতেন শিষ্য পরমানন্দকে নিয়ে। আমরা থাকতাম আরেকটি ছোটো ঘরে। তিনজনে মাটিতে শুতাম, জায়গা খুব বেশি লাগত না। পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো বালাই ছিল না। আমি নিজে পরতাম একটি ছোটো ধুতি আর গেঞ্জি, বিছানা ছিল একটি মাদুর আর একটি ইট, বালিশের বদলে। সে ঘরের সঙ্গে ছিল ছোটো একটি বারান্দা। সেটাই ছিল আমাদের খাবার জায়গা। হাত বিশেক দূরে ছিল ছোটো একটি রান্নাঘর, একটি মাটির উনুনসহ। আর তারি এক কোণে ছিল ছোট্ট একটি ভাঁড়ার।

জলের জন্য একটি কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। গ্রীষ্মের দিনে জল অনেক নীচে চলে গিয়েছিল, লম্বা দড়ি আর বালতি দিয়ে অনেকটা টেনে জল তুলতে হত। সে জলে রান্নাবান্না আর অন্যান্য কাজ চলত। চানের জন্য যেতাম গঙ্গাতে, অন্তত আধ মাইল দূরে। আর গঙ্গা থেকেই খাবার জল নিয়ে আসতাম। সে ভার ছিল শিবদা আর আমার উপর। মনে পড়ে, সেজন্য গোড়ার দিকে আমাদের কত রকম কসরত করতে হয়ে-ছিল। বেশ মোটা, সরুগলা ঘড়া, জল ধরত বিশ সেরের মতো। কিছুদিন বেশ কষ্ট করে থেমে-থেমে ঘড়া বয়ে নিয়ে আসতাম নানা ভাবে চেষ্টা করে, কখনো মাথায় গামছাকে বিড়ে করে তার উপর বসিয়ে, কখনো কাঁধে, কি কাঁখে করে। কিন্তু কিছুতেই যেন ঠিক সুবিধে হত না। হঠাৎ একদিন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ঘাড়ের উপর গামছা মোটা করে পেতে মাথা নীচু করে তার উপর জলের ঘড়া বসিয়ে চলা আরম্ভ করলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, সেটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। তারপর থেকে না থেমে সারা পথ ঘড়া বয়ে সহজেই চলে আসতাম। মনে আছে আমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখে তুজনেই কত

খুশি হয়েছিলাম।

রান্নাঘরের কাজ করতাম আমরা চারজনে পালা করে। কাঠসংগ্রহ, মশলা পেশা, রান্না করা—সব-কিছুই অবশ্য নিজেদেরই করতে হত। বলা বাহুল্য, আমাদের "মেনু" ছিল একান্ত সাদাসিধে। মোটা চালের ভাত, পাতলা ডাল—(অড়হর, ছোলা, কি খেসারি)—আর পালঙশাক কি অন্য একটা সবজি। রাত্তিরে ভাতের বদলে হাতরুটি। গোলাপঠাকরুনের কাছে শিক্ষা আমার বিশেষ কাজে লাগত। তবে কলকাতার মঠের তুলনায় এখানকার কাজ একান্তই নগণ্য আর প্রাণহীন বলে মনে হত। সকালবেলা আমাদের বরাদ্দ ছিল মুড়ি বা খই, গুড় বা বাতাসাসহ। দুধ বা চায়ের কোনো বালাই ছিল না। মাঝে-মাঝে বিশেষ কারণে দইমিষ্টি জুটত, তখন সেটাকে উৎসব বলে মনে হত।

ঘরের সঙ্গেই কাঠা দুই জমিতে একটি ছোটো বাগানের গোড়াপত্তন করা হয়েছিল। তাতে নিজেদের সংসারের জন্য সামান্য শাকসবজি আর পুজোর জন্য সাধারণ ফুলের ব্যবস্থা হত। এ বাগানের কাজ অনেকটা গুরুজি নিজেই করতেন হাতখন্তি দিয়ে। জলের অভাবই ছিল সবথেকে বড়ো সমস্যা। রান্নাঘরের ফেলা জল আর কুয়ো থেকে তোলা জল দিয়ে কোনো-মতে কাজ চালানো হত।

সকাল-সন্ধ্যায় দুবেলা সবাইকে ধ্যানস্থ হয়ে নিজেদের মন্ত্র জপ করতে হত। তা ছাড়া রুটিনের মধ্যে ছিল সন্ধেবেলা সবাইমিলে করতাল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ কীর্তন করা ও ভজনগান করা, যথা—'বাসনা দুঃখের হেতু, হরিভক্তি মোক্ষসেতু, তাই বলি ভক্তিভরে হরিকে ভজো না; 'পাতকী বলিয়া কি গো পায়ে ঠেলা ভালো হয়'—ইত্যাদি।

আশ্রমের সবথেকে পরিশ্রমের কাজ সে সময়ে ছিল বাইরে। আমি ওখানে হাজির হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক হল, সবটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা হবে। উদ্দেশ্য ছিল দুটো। আশ্রমের সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া আর বাইরের জীবজন্তু গোরু-বাছুরছাগল ইত্যাদিকে বাইরে রাখা। দূরের গ্রাম থেকে বোঝা-বোঝা কচাগাছ আনার ব্যবস্থা হল। সেগুলোকে পোঁতার ভার পড়ল শিবদা আর আমার উপর। তাই সকালবেলা আহ্নিক শেষ করে শাবল হাতে নিয়ে তুজনে চলে যেতাম অনেকটা দূরে কচা-গাছ পোঁতার কাজে। ঘণ্টা চার-পাঁচ মাঠে কাজ করে ছুটি পেতাম খাওয়া আর বিশ্রামের জন্য। তারপর আবার বিকেলে কাজ শুরু করতাম। তখন রোজ অন্তত আট ঘণ্টা খোলা মাঠে খাঁ-খাঁ রোদে কাজ করেছি দিনের পর দিন।

কচাগাছগুলো ছিল সরু আর লম্বায় পাঁচফুটের মতো। প্রত্যেকটি গাছ পুঁততে হত ফুটখানেক গর্ত করে, লম্বা লাইন ধরে, ফুট দেড়েকের ব্যবধান রেখে। পাথরের মতো শক্ত মাটিতে, মামুলি ধরনের শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে-খুঁড়তে আমরা হাঁপিয়ে পড়তাম। ক্লান্ত হয়ে শাবলের উপর ভর দিয়ে কোনোমতে একটু জিরিয়ে নিতাম, মাঝে-মাঝে ঝিমিয়েও পড়তাম। দূর থেকে দেখতে পেলে গুরু হাঁক দিয়ে উঠতেন, 'কী হচ্ছে ওখানে? কাজ ফেলে রেখে কুঁড়েমি করলে চলবে না।'

মাঝে-মাঝে শাবল রেখে দশ-পনেরো মিনিটের জন্য মাঠের এক কোণে খেজুরগাছের নীচে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে খেজুর পেড়েছি। সেই শুকনো আধপাকা খেজুরকেই তখন উপাদেয় মনে হয়েছে। আমাদের এই কর্তব্যচ্যুতি গুরুজীর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই খেজুর খাবার সঙ্গে-সঙ্গে বকুনিও খেয়েছি।

ঘরে বা তার আশেপাশে শিবদা আর আমি মন খুলে কথা বলার সাহস পেতাম না। আমাদের কথা বলার সবথেকে ভালো সুযোগ ছিল গঙ্গায় যাতায়াতের পথে, অবশ্য শচীন বা শিশু সঙ্গে থাকলে তা সম্ভব হত না। তা ছাড়া সুযোগ পেতাম তুজনে পাশাপাশি গর্ত খুঁড়ে কচাগাছ পোঁতার বেলা। অবশ্য তা-ও গুরুজীর দৃষ্টি এড়াত না। নীচু গলায় কথা বললেও

উনি ধরে নিতেন, আমাদের মধ্যে হয়তো কিছু "অধার্মিক" আলোচনা চলছে। তা ছাড়া কর্তব্যে শৈথিল্য যে সন্ন্যাসপথের অনুপযোগী, সে কথাও কঠোর স্বরে বার-বার মনে করিয়ে দিতেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় অনেক ছিল, আর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে তা বেড়েই চলেছিল। দুজনেরই মনে হত সেই ময়নামতীর স্বপ্ন, দেশ-সেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কথা। তার সঙ্গে এ আশ্রমজীবনের তো বিন্দুমাত্র মিল নেই। আমরা চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, নিজের মুক্তি নয়। সারা দেশ জুড়ে বিরাট আন্দোলন চলেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য, অথচ তার সঙ্গে আমাদের তো বিন্দু-মাত্র যোগ নেই। সে সম্বন্ধে একটি কথাও শুনতে পাইনে। যে পথে আমরা দৈবাৎ এসে হাজির হয়েছি সে যে নিতান্ত প্রাণহীন, অর্থহীন। এ পথ ধরেই কি আমাদের চলতে হবে? না, এই "মুক্তির পথ" থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমাদের সেই পুরোনো স্বপ্নকে সত্য করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করব?

নানা কাজে আমরা ব্যস্ত থাকতাম সারাদিন, সন্ধ্যা-আহ্নিকও করে যেতাম যথারীতি, তাতেও কোনো ত্রুটি ঘটে নি। তবু মন বোঝাই করে ছিল সংশয়, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম। শিবদার সহজাত প্রেরণা আর আদর্শ তখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। গেরুয়ার অন্তরালে তার স্পন্দন সহজে অনুভব করতে পারতাম। অথচ কোথায় গেলে আর কী করলে ভালো হয়, তখনো ভেবে কূল-কিনারা পাই নি। দিনগুলো তাই চলে যাচ্ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়।

"গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া"

আমাদের মতো দুটি তরুণ আর তুখোড় শিষ্য সংগ্রহ করায় গুরু শ্যামসুন্দরানন্দের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল সন্ন্যাসী-মহলে আর নিজের ভক্তবৃন্দের কাছে। তবে এই ত্যাগধর্মপথে আমাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশ সন্দিহান ছিলেন, আর সে সন্দেহ প্রবল ছিল বিশেষ করে আমার বেলা। শিবদার সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল, আর তাঁর উপর আমার বিশেষ প্রভাবও ছিল—সেটা গুরুজীর অজানা ছিল না। সেটাকে তিনি কখনো সুনজরে দেখতে পারেন নি। সম্ভবত মনে-মনে তাঁর একটা ভয় ছিল যে, শিবদাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে আমি বিপথে নিয়ে যেতে পারি। সে-জন্যই আমাদের দুজনে নিরিবিলি কিছু আলাপ-আলোচনা হচ্ছে ঠাহর পেলেই হাঁক দিয়ে উঠতেন।

প্রায় গোড়া থেকেই আমার উপর গুরুজীর স্নেহ-আকর্ষণ দুই-ই ছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ছিল খানিকটা রোষ আর আক্রোশ। তার কারণ অবশ্য তখন বুঝতে পারি নি। তবে পরে পশ্চাদ্‌দৃষ্টিতে তা সুপরিস্ফুট হয়ে গেল। গুরুর দাবি ছিল অন্ধভক্তি। তাঁর আদেশ নির্দেশ বিনা বিচারে, বিনা দ্বিধায় শিরোধার্য করতে হবে, এটাই ছিল তাঁর দাবি। কিন্তু সে দাবি আমি কখনো ষোলো আনা মেটাতে পারি নি, এমনকী নিজের উপর জবরদস্তি করেও। আমার তখন বয়স ছিল বারো-তেরো, কিন্তু সে তুলনায় আমার মেরুদণ্ডের নমনীয়তা তাঁর মাপকাঠিতে যথোচিত ছিল না। ফলে আমাকে নানাভাবে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে।

গুরুজী বলতেন, মানুষ হল কীটানুকীট। তার একমাত্র কাম্য হল মুক্তি। সে মুক্তি মানুষ লাভ করতে পারে শুধু ভক্তি দিয়ে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে। ভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। তাই সর্বাগ্রে তাকে ত্যাগ করতে হবে অহমিকা। 'আমি কিছু করতে পারি' বলা বা ভাবার মধ্যেও রয়েছে অহমিকা। অধ্যয়ন আর জ্ঞানার্জনের বেলাও তাই। তার মধ্যেও রয়েছে নিছক অহঙ্কার, তাই তারা মুক্তিসাধনার অন্তরায়।

গুরুর এই দর্শন-নীতি কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি, অথচ প্রতিবাদ করবার সাহসও আমার ছিল না। কাকা থেকে আরম্ভ করে অনেক বিজ্ঞ আর বয়স্ক লোক যে-সাধুর কাছে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে মাথা নত

করতেন, আমি সেখানে কী করে মুখ ফুটে তাঁর কথার প্রতিবাদ করব? তাই আমিও তাঁর কথা চুপ করে মেনে নেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারি নি, পদে পদে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটত।

কুমিল্লায় যখনি তিনি কাকার বাড়িতে এসে হাজির হতেন, তখনি সন্ধেবেলা তাঁর দর্শনের জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হত। আমি হাজির হতাম একটু দেরিতে, থাকতামও অল্প সময়। সেটা তাঁর মনঃপূত হত না। এ নিয়ে তিনি অন্য ভক্তদের সামনেই ঠাট্টা করতেন আর মনে করিয়ে দিতেন যে, অধ্যয়নে অত আসক্তি থাকলে মুক্তিলাভ কখনো সম্ভব হবে না।

মনে আছে, একদিন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম। শেষ করে গুরুজীর কাছে যেতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি ব্যঙ্গস্বরে বললেন, 'কী হচ্ছিল এতক্ষণ, পণ্ডিতজী? আবার বুঝি সেই লেখাপড়া হচ্ছিল?' গুরুর দৃষ্টিতে লেখা-পড়াটা ছিল গুরুতর অপরাধ।

তাঁর আরও আদেশ ছিল,—'মেয়েদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকাবে না। চোখ থাকবে সব সময় তাঁদের পায়ের দিকে।' এ আদেশের কারণ কী ছিল আমার অজ্ঞতা-ভরা তরুণ জীবনে তা বোধগম্য হয় নি। অবশ্য গুরুর নিজের বেলা সেজাতীয় কোনো নিয়মের বালাই ছিল না। বরঞ্চ দেখেছি কত সাগ্রহে তিনি বিবাহিতা তরুণী শিষ্যাদের কাছ থেকে শ্রীচরণ-সেবা গ্রহণ করতেন। সাধারণত স্তিমিত নয়নে।

আশ্রমে আমার সবচেয়ে দুঃসহ মনে হত হাড়ভাঙা খাটুনি নয়, কৃচ্ছ্রসাধনও নয়, সেসব সহজেই অগ্রাহ্য করে চলেছিলাম। সবচেয়ে দুঃসহ ছিল গুরুর আদেশে একটানা অনধ্যয়ন। মনে হত এ আদেশে কোথাও যেন একটা অবিচার নিহিত রয়েছে।

কিছু দিনের মধ্যেই সে সংশয় দৃঢ়তর হল। কাকার নির্দেশে গুরু শিবদার সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন টোলের পণ্ডিত রেখে। ঠিক হল শিবদা আদ্য, মধ্য, উপাধি পরীক্ষার জন্য তৈরি হবেন। কাকা নিয়মমতো উদারভাবে আশ্রমে আর্থিক সাহায্য করতেন। কাজেই গুরু তাঁর মন জুগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ষোলো আনা সচেতন ছিলেন। অধ্যয়ন যে অহমিকার পরিচয় আর মুক্তির অন্তরায়, গুরুজী শিবদার বেলা সে কথা সহজেই ভুলে গেলেন। তাঁর আচরণে এই পার্থক্য দেখে আমি মনে-মনে আহত হয়েছিলাম।

গুরু আমার কাছ থেকে চেয়েছিলেন অন্ধভক্তি। তখন বহুবার নানা উপলক্ষে শুনেছি—'বিশ্বাসে মিলায় কেষ্ট, তর্কে বহুদূর'। গুরুর আদেশ নির্বিচারে পালন করতে হয়। নিজের উপর জবরদস্তি করেও সে-মন্ত্র আমি মেনে নিতে পারি নি। অন্ধভক্তি ছিল আমার রীতের বিরুদ্ধে। শিবদা আর আমার প্রতি তাঁর আচরণে অত বড়ো পার্থক্য দেখে আমার ভক্তি আরো টলমল করে উঠল।

আসলে গুরু চেয়েছিলেন আমার আত্মবিশ্বাস, জ্ঞানলিপ্সা আর বিচারবুদ্ধি নির্মূল করে দিতে, ভক্তি আর মুক্তির রূপ বিকৃত করে আমাকে একরকম ক্রীতদাস করে রাখতে। এ জীবনে আমি বহুবার বহু বিপদ আর সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছি। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আর মারাত্মক বিপদ হল আমার সেই অর্ধস্ফুট যৌবনের আশ্রমজীবন। সন্ন্যাসের নামে সেখানে আমার সর্বনাশের সূচনা হয়েছিল। সেই মহাসংকট থেকে কিভাবে অব্যাহতি পেলাম ভাবলে আজো মনে বিস্ময় জাগে।

৬ : বড়দার কারামুক্তি ও নতুন জীবন

বিশ্বযুদ্ধ সাঙ্গ হল। ব্রিটিশ সরকার তরুণ রাজদ্রোহী-দের দলে দলে জেলখানা থেকে ছেড়ে দিলেন। এক-দিন বিনা সংবাদে বড়দা একটি ছোটো ট্রাঙ্ক হাতে নিয়ে কুমিল্লা জেলা থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাঁকে বরণ করে নেবার জন্য

কোনো আনন্দ বা উৎসবের আয়োজন করা হয় নি। তবে মা-বাবা নিশ্চয়ই তাঁদের দৈনন্দিন পুজা-অর্চনায় বড়দার প্রত্যাবর্তনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর কল্যাণ আর সুমতির জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

বড়দার আস্তানা হল উঠোনের দক্ষিণ দিকে টিনের ছাদওয়ালা একটি ছোটো ঘরে। সারা দিন প্রায় চুপ করেই কাটাতেন। চব্বিশ ঘণ্টায় হয়তো বড়ো জোর একশটি শব্দ ব্যবহার করতেন। মনে হত, এ যেন তাঁর অন্তরীণ জীবনেরই রূপান্তর মাত্র। তবে মস্ত বড়ো তফাত হল এই যে এবার তিনি স্বেচ্ছাবন্দী, নিজের বাড়িতে।

বড়দা কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন ১৯১৫ সনে। তারপরে ভর্তি হন ওখানকার ভিকটোরিয়া কলেজে আই-এ পড়ার জন্য। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয় ১৯১৬ সনে ১২ সেপটেমবর। জেলখানা থেকে ফিরে এসে তিনি ঠিক করলেন, ভিকটোরিয়া কলেজেই আই-এর জন্য পড়া শেষ করবেন। ইচ্ছা করলে অবশ্য এক বছর পরেও পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে পারতেন। কিন্তু সেটা তাঁর মনঃপুত হয় নি। তাই কয়েক মাস বিশেষভাবে খেটে পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবে পাশ করলেন। ফলের দিক দিয়ে একটি স্কলারশিপ তাঁর প্রাপ্য ছিল, কিন্তু পড়ায় ব্যাঘাতপড়েছিল বলে, অর্থাৎ অনিয়মিতছাত্র বিবেচিত হয়েছিলেন বলে তিনি সেই বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন।

কিছুদিন পরে ঠিক হল বড়দা কলকাতায় গিয়ে বি. এ. পড়বেন। সেখানে সিটি কলেজে ভরতি হলেন, পড়াশুনাও নিয়মিত আরম্ভ হল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই একদিন দুপুর রাত্রে বাড়িতেএসে হাজির হলেন নিজের ছাত্রজীবনের সামান্য সরনজামসহ। দেখে সবাই অবাক হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার কারণ জানা গেল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ছাত্রসমাজের উপর মহাত্মাজীর বিশেষ নজর ছিল। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করা ছিল তাঁর প্রোগ্রামের এক প্রধান অংশ। তাঁর আহ্বানে স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্রের দল বেরিয়ে এল হাজারে-হাজারে। সে আহ্বান অগ্রাহ্য করা বড়দার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে স্বদেশানুরাগের উন্মাদনা একদিন তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে, আত্মবিসর্জনের দিকে, সেই উন্মাদনাই আজ তাঁকে সবলে ঠেলে দিল অসহযোগ আন্দোলনের পথে। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়।

বড়দা যোগ দিলেন কুমিল্লায় সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুলে স্বেচ্ছাসেবকরূপে। সেখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন বিনা বেতনে ; শীগগিরই তার একটি স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন। বড়দা এ-কাজ করেছিলেন বছর চারেক। সেই সময়েই তিনি বিশেষভাবে আরম্ভ করেন বাঙলা ছন্দের স্বরূপনির্ণয় আর বিশ্লেষণ, আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা।

বড়দার দৃষ্টান্তে আর প্রেরণায় বাড়ির আর সবাই স্কুলকলেজ ছেড়ে দিল। মেজদা (সুবোধ) কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অসহযোগের দিনে পরীক্ষা না দেওয়াই সাব্যস্ত হল। কুমিল্লা ছেড়ে তিনি চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে গিয়ে উঠলেন আমাদের পিসতুতো ভাই ধীরেন ঘোষের বাড়িতে। ধীরেনদা তখন ছিলেন শ্যামবাজারে পুলিশ ইনসপেকটর। তিনি অনেক বলে মেজদাকে রাজি করালেন পরীক্ষাটা দিতে। শেষ মুহূর্তে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় সেনটার বদল করা হল। মেজদা বই-নোট ছাড়া শুধু মনের জোরে পরীক্ষা দিয়ে ডিসটিঙশন নিয়ে পাশ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি রাঁচিতে অ্যাকাউন্টস্ আপিসে কাজ নেন, সেখানেই সারা জীবন কাটান। তাঁর চাকুরি খুব উঁচু স্তরের ছিল না, যদিও পরে তাঁর কাজের গুণে অনেকটা পদোন্নতি হয়েছিল। আমাদের অস্বচ্ছল যৌথ পরিবারের ভার মেজদা বহু কাল সানন্দে বহন করে গেছেন।

সেজদা (প্রমোদ) প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করবার পর আর কলেজে প্রবেশ করেন নি, কলকাতায় গিয়ে একটি পরীক্ষা পাশ করে ঈস্ট ইনডিয়া রেল-

ওয়েতে কাজ নেন। বাবার একান্ত ইচ্ছায় কয়েক বছর পরে মোক্তারি পাশ করে কুমিল্লায় মোক্তার হন। সেজদা অনেক বছর সে কাজ করেছেন, তারপর স্বাধীনতা ও বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে কুমিল্লা ছেড়ে বিহারে ধানবাদে একটি চাকুরি নেন। সেজদার উপরেও পরিবারের দায়িত্ব অনেকখানি পড়েছিল। বিনাবাক্যে সে কর্তব্য তিনি বহু কাল পালন করেছিলেন।

আমার ছোটো ভাই কানু বোধহয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর আর পড়াশুনার সুযোগ হয় নি। তখনথেকে সে একটি ঘড়ির দোকানে কাজ নেয়। কাজে তার যথেষ্ট সুনাম হয়। পরে সে নিজেই একটি ঘড়ির দোকান চালাত। কুমিল্লার গণ্যমান্য লোকদের বলতে শুনেছি—'এখন মেরামতের জন্য ঘড়ি আর কলকাতায় পাঠাবার প্রয়োজন নেই, এই দোকানেই উৎকৃষ্ট সার্ভিস পাওয়া যায়।' ১৯৪৩ সনে একটা দারুণ রোগে আক্রান্ত হয়ে কানু কলকাতায় এসে মারা যায়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।

আমার বেলা অসহযোগ হল অন্য ধরনের,—স্কুলের সঙ্গে নয়, সংসারের সঙ্গে। আমার গৃহত্যাগের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। বাড়ির কারোর সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। সবাইকে ভুলে যাওয়াই ছিল তখন আমার "ধর্ম"। কিন্তু তাই বলে বাড়ি আমায় ভোলে নি, বরঞ্চ হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বড়দা একদিন উদ্ব্যস্ত ছিলেন দেশোদ্ধারের জন্য, এবার তাঁর উপর এসে পড়ল অন্য এক উদ্ধারক্রিয়ার ভার—আমাকে আশ্রম থেকে ফিরিয়ে আনার।

[ক্রমশ

ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা

কমলেন্দু ধর

ইতিহাসের একটি ঘটনা—রুশ অভিযানে বিপর্যয়ের পর ভিলনার থেকে পারি ফিরলেন নেপোলিয়োঁ। সময় লাগল ৩১২ ঘণ্টা। দূরত্ব ছিল ১৪০০ মাইল। আজ ১৪০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? রেলে বা বিমানে যথাক্রমে ২৫ বা ৪ ঘণ্টা, বা তারও কম। সময়ের ব্যবধানে এই যে পরিবর্তনটা ঘটে গেল, তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার, আর উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রায়োগিক বিদ্যায়। এখানে আমরা শুধু উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার কথাই বললাম। সমান্তরালভাবে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতির অন্য দিগন্তও যত প্রসারিত হয়ে চলেছে, মানবজাতির চলমান জীবনের গতিও তত দ্রুততর হয়ে পড়ছে, পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে শুধু মানবজাতির বহিরাবরণে নয়, মানসিক-মানবিক জগতেও। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, মানবজাতির আর্থ - সামাজিক - সাংস্কৃতিক জীবনকেও বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি যেভাবে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে—তা এক কথায় বিস্ময়কর। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পর্বে জনজীবনে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রভাব আরো বিস্ময়কর, অনেক বেশি গভীরে প্রোথিত।

এই পটভূমিতে সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের প্রচলন নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। সাইবারনেটিকস বিজ্ঞান কী এবং কেন—তা বলব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাইবারনেটিকস-এর ব্যবহারে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে কী কী রূপান্তর হয়েছে বা হয়ে চলেছে, তা-ই হবে আলোচনার বিষয়। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনাতেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছি। কারণ, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানের চর্চা তথা গবেষণা ভারতবর্ষে এখনও একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। কিন্তু সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের সূত্রে উদ্ভূত প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ধারায় ভারতীয় জনজীবনে কতগুলি মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেছে,

এবং ঘটে চলেছে। এই রূপান্তরগুলি গভীর পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তারই প্রাথমিক প্রয়াস এই লেখাটি।

আলোচনা শুরু করার আগে প্রথমেই একটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে। তা হল—বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মৌলিক পার্থক্যটি। অনেক সময়ই দেখা যায়, প্রযুক্তিজ্ঞানই বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়ে যায়। আসলে তো প্রযুক্তিজ্ঞান কখনোই, কোনো স্তরেই বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের কাজ হল কার্য আর কারণ (cause and effect) সম্পর্কে মৌলিক অন্বেষণ। অর্থাৎ, কোনো বস্তু বা প্রযুক্তি ব্যবহারের পেছনে যে নিয়মনীতি কাজ করে, তার স্বরূপ আবিষ্কার করা। যেমন, সুইচ টিপলে আলো জ্বলে—এ হল প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক ফল। কিন্তু কেন আলো জ্বলল—তার কার্য এবং কারণ আবিষ্কারই বিজ্ঞান। তা ছাড়া, বিজ্ঞানের কার্য আর কারণ সম্পর্কে যে তথ্য আর তত্ত্ব কাজ করে, তা নিয়ে বেশির ভাগ মানুষেরই কোনো কৌতূহল নেই, তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে তার কোনো প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। খুব সামান্যসংখ্যক মানুষই তা নিয়ে জড়িত, ভাবিত। কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্রেই উদ্ভূত যে প্রযুক্তিজ্ঞান, তার সাথে অনেক বেশি মানুষ সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। কারণ, প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রয়োগে যে বস্তুরাশি উৎপাদন হয়, তা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। তাই দেখা যায়, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জনজীবনকে যতটা সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক দ্রুত প্রভাবিত করে প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক অংশ। যেমন, সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের আবিষ্কার জনজীবনকে যতটা না প্রভাবিত করেছে তার কয়েক শত গুণ বেশি প্রভাবিত করেছে গণকযন্ত্র—যাকে আমরা কমপিউটার বলি। এই গণকযন্ত্রটি সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের পথরেখায় প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক ফসল। ভারতবর্ষেও সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানের গবেষণা ভ্রূণের পর্যায় রয়েছে। কিন্তু ধার-করা প্রযুক্তিজ্ঞানে তৈরি গণকযন্ত্রের সাথে আমদানি-করা গণকযন্ত্র মিলিয়ে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে এক বিচিত্র জটিল সঙ্কটের মুখোমুখি করে তুলেছে।

১. সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান কী এবং কেন

এক কথায়, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান হল, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। এবং তা যন্ত্রপাতি আর প্রাণিজগৎ—উভয়ের সম্পর্কেই প্রযুক্ত। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার গণিতজ্ঞ নরবার্ট উইনার প্রথম সাইবারনেটিকস শব্দটি ব্যবহার করেন। সাইবারনেটিকস শব্দটি গ্রীক শব্দ Kubernetes থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল : Steersman। বাঙলায় 'কর্ণধার' করা যেতে পারে। নরবার্ট উইনার তাঁর বই Cybernatics : on Control and Communication in the Animal and the Machine-এ সাইবারনেটিকস-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, 'Cybernetics', as 'the entire field of control and communication theory whether in the machine or in the animal.' Wiener 1948, p. 19। ১৯৪৮ সালের পরবর্তী সময়ে উন্নত দেশগুলিতে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা আর চর্চা হয়েছে, হচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে জারমানিতে প্রকাশিত হচ্ছে 'Kybernetic' পত্রিকা। এ বিষয়ে আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গবেষকের নাম হচ্ছে Maron M. E., Ashby William R. এবং Shannon।

সাইবারনেটিকস বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Shannon তার "The Mathematical Thory of Communication"-এ গুরুত্ব দিচ্ছেন একটি "কোড"-এর ধারণার উপর। এবং তিনি দেখাতে চেয়েছেন, এই কোড ব্যবহারের ফলে কাজের দক্ষতা

কত বেড়ে যেতে পারে। এই কোড একটি সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আমরা পেয়ে যাব। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক এই পদ্ধতিকে 'numerically controlled' বা সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বলা হয়। কারণ, কোড-এর নির্দেশ সংখ্যার সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন সর্বাধুনিক ব্যাঙ্কিঙ কাজকর্ম বহুলাংশেই এর সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের একজন গ্রাহক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার মাধ্যমে তার ব্যাঙ্কিঙ লেনদেন চালাতে পারেন। ব্যাঙ্কও ওই নির্দিষ্ট সংখ্যাটির সাহায্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকটির "অ্যাকাউনট" সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেয়ে যান। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই কাজের পুরো অংশটিই পরিচালিত হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। শুধু একজন মানুষের প্রয়োজন হচ্ছে যন্ত্রটি ঠিকমতো চলছে কিনা—তা পর্যবেক্ষণ করা।

সাইবারনেটিকস-এর আবিষ্কারের উৎসে কাজ করে মানুষের 'ব্রেন' আর 'স্নায়ুব্যবস্থা' (nerve system) যে কর্মধারায় প্রবাহিত আর ক্রিয়াশীল—তার পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ থেকে। সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত হন যে, মানুষের ব্রেন আর স্নায়ুব্যবস্থার "স্মৃতি-ধারণ" (memory reserve) করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুতরাং যন্ত্রও একইভাবে স্মৃতিধারণ করে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই সূত্রেই সাইবারনেটিকস তত্ত্ব-এর প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক ধারায় এখনও পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা সেরা উৎপাদিত বস্তুটির নাম গণকযন্ত্র বা কমপিউটার। যেজন্য অনেকেই গণকযন্ত্রকে "হিউম্যান ব্রেন" হিসাবেও ব্যাখ্যা করেছেন। তাই একজন সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানী বলছেন, 'The brain could be viewed as a complex communication, computer and automatic control system.' এখানে আরেকটি তথ্যও অবশ্যই উল্লেখনীয় যে, 'ডিজিটাল কমপিউটার' উদ্ভাবনের পর থেকেই সাইবারনেটিকস-এর চর্চা আর ব্যাপ্তি দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালে প্রথম ডিজিটাল কমপিউটার তৈরির কাজ শেষ হয়। তারপর থেকেই সাইবারনেটিকস-এর অগ্রগতি দ্রুততর হয়ে পড়ে। এবং কমপিউটারে তত্ত্ব, প্রযুক্তিজ্ঞান আর প্রায়োগিক বিদ্যা জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, গভীরে প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া, সময়ের অগ্রবর্তী ধারায় কমপিউটারের স্মৃতিধারণক্ষমতা যত বাড়তে থাকে, জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাবও ততই প্রসারিত হয়ে পড়ে।

এবার আমরা সাইবারনেটিকস-এর দুটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি।

(১) এই ব্যবস্থা মূলত স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোনো কারখানায় উৎপাদন-ব্যবস্থা মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেই পরিচালিত হতে পারে। এখানে মানুষের কাজ হল যন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, তাই লক্ষ রাখা। বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস, পেট্রোকেমিক্যালস, তৈলশোধনাগারে এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, কোনো দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হওয়া থেকে প্যাকিঙ হওয়া পর্যন্ত যে বিভিন্ন পর্ব রয়েছে—তা এখন যন্ত্রের সাহায্যেই করা সম্ভব। এ ছাড়াও, উপগ্রহ-উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে মহাকাশগবেষণা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

(২) উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার যে প্রয়োজন রয়েছে—তাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এ ব্যবস্থাকে বলা যায়, 'provision for them to regulate themselves'। বিরাট কারখানার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যন্ত্রে যে কাজ চলেছে, সুইচ টিপে তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ঘরে বসে। এ ব্যবস্থাকে 'কনট্রোলরুম অপারেশন' বলা হয়। এই কনট্রোলরুমে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরদায়

ফুটে উঠছে কোথায় কী কাজ চলছে, কোন্ যন্ত্র কিভাবে কাজ করছে। কোনো যন্ত্র খারাপ হলে তাও পরদায় ফুটে উঠছে। এখানে উৎপাদনের পুরো অংশটাই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। মানুষ শুধু কনট্রোলরুমে বসে পর্যবেক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, আমেরিকান মোটর কোমপানিতে পর-পর ৫০০টি যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কাজ করে চলেছে। আর ৫০০টি যন্ত্র ঠিকমত কাজ করছে কিনা, একজন মানুষ কনট্রোলরুমে বসে তা লক্ষ রাখছেন। অর্থাৎ ৫০০টি যন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন একজনমাত্র মানুষ।

১৯৪৮ সালের পরবর্তী তিন দশকে সাইবার-নেটিকস-এর প্রসার আর ব্যাপ্তি জনজীবনের বিভিন্ন প্রবাহে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তাই দেখা যায়, মনস্তত্ত্ববিদ্যা থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাজনীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর জীবনচর্চার বিভিন্ন ধারার সাথে সাইবারনেটিকস-এর সম্পর্ক গভীরতর হয়ে উঠেছে। এবং জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন আঙিনায় আলাদা-আলাদা ভাবে সাইবারনেটিকস-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন "রাজনৈতিক সাইবার-নেটিকস", "সামাজিক সাইবারনেটিকস" ইত্যাদি। আধুনিক রাজনীতি-বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক সাইবার-নেটিকস-এর সাহায্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ করছেন। তেমনি সমাজবিজ্ঞানীরাও সামাজিক সাইবারনেটিকসকে তাদের কর্মপ্রবাহে যুক্ত করেছেন।

একটি বিতর্ক

পরিশেষে, একটি বিতর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করে প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করছি—যার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। বিতর্কের বিষয়টি হল সাইবারনেটিকসকে বিজ্ঞান হিসাবে মেনে নেওয়া এবং অস্বীকার করা নিয়ে। কারণ, অনেকেই সাইবার-নেটিকসকে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁরা একে প্রযুক্তিজ্ঞানের অংশ হিসাবেই দেখতে আগ্রহী। আবার, কেউ-কেউ সাইবারনেটিকসকে শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা (অটোমেটিক কনট্রোল সিসটেম) হিসাবেই গণ্য করছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায়—মানুষকে সরিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণই হল এর বৈশিষ্ট্য। বিপরীতে আবার অনেকেই সাইবারনেটিকসকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই মেনে নিয়েছেন। তাঁদের মতে, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানের সাহায্যে জনজীবনের প্রতিটি স্তরের সমস্যা নিয়েই আলোচনা সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও নির্দিষ্ট করা যায়। আমরা এখানে সাইবারনেটিকসকে বিজ্ঞান হিসাবে মেনে নিয়েই পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করছি।

২. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা

দেশ-কাল-সময়ের অগ্রবর্তী ধারায় বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিজ্ঞানের যে বিকাশ চলছে পৃথিবী জুড়ে, তার সাথে সাযুজ্য রেখে ভারতবর্ষও এগিয়ে চলুক—প্রত্যেক সচেতন ভারতবাসীই তা চাইবেন। বিজ্ঞানের নিত্যনব ধারার গবেষণা চলুক ব্যাপকভাবে, প্রযুক্তি-জ্ঞানের প্রায়োগিক বিদ্যায় ভারতবর্ষ সম্পদে প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক—সমগ্র ভারতবাসীর এ একান্ত কামনার বস্তু। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিজ্ঞানের কল্যাণ-ধারায় নিরন্ন কোনো ভারতবাসীর যদি ছুবেলা পেট পুরে খাদ্য জোটে, কোনো নিরক্ষর মানুষ যদি শিক্ষার আঙিনায় পৌঁছতে পারেন, কোনো বেকার যুবক যদি চাকরি পান, সর্বোপরি, কারো যদি বৈজ্ঞানিক-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে—এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে। আর সব ভারতবাসীর জীবনেই যদি তা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে? কারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই তো বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিজ্ঞান।

ভারত সরকার বোধহয় এদিকে দৃষ্টি রেখেই বিজ্ঞান

আর প্রযুক্তিচর্চার গবেষণায় এবং প্রসারে সচেতনভাবে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন, অনেক কমিটি গড়েছেন, এবং বিপুল অঙ্কের টাকা প্রতি বছর ব্যয় করে চলেছেন। ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ব্যয় করেছিলেন ৪.৬৮ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৮৪-৮৫ সালে ব্যয় করেছেন ১,৮৯০.৫৮ কোটি টাকা। এবং ১৯৯০-৯৫ সালের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭,৫৩৫ কোটি টাকা। কেবল মহাকাশগবেষণার জন্যই ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটে ৪৩২ কোটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এত বিপুল অঙ্কের টাকায় ভারতবর্ষের ১৩০০-র উপর গবেষণাকেন্দ্রে ৩০ লক্ষ কর্মী নিয়ত কাজ করে চলেছেন—ভারতবর্ষকে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য। এই কারণেই ভারত সরকার প্রতিভন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মীর জন্য বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। আরেকটি ঘটনা—কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি 'An Approach to a Perspective Plan for 2001 AD' শিরোনামে তাঁদের পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি হল : 'The country should explore the possibilities of undertaking research and development project with other countries in selected industrial sections।' "যৌথ উদ্যোগে"র অনেক কাহিনী-কিংবদন্তীই আমাদের জানা আছে। এবার তীক্ষ্ণ নজর রাখবার বিষয় হবে এই "যৌথ উদ্যোগের গবেষণা" ভারতবাসীকে কোন্ পথে নিয়ে যায়। স্বয়ম্ভরতা, না, নতুন বিদেশী বন্ধন? যাক, গবেষণার নামে এই বিপুল অর্থ আর জনসম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, তার বিস্তৃত বিতর্কিত আলোচনায় প্রবেশ না করে আমরা ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব সায়েনস-এর অধ্যাপক এ. কে. এন. রেড্ডির একটি মন্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। মন্তব্যটি হল, 'The goals of science in India are determined by western concept and not by what is relevant to the needs and conditions of the people who live in India's village. This mismatch makes research meaningless'। পরিশেষে বলা প্রয়োজন, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস বিজ্ঞান-এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে হলেও এই আলোচনায় বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও কম-বেশি সম্পর্কিত হয়ে পড়বে। কারণ, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান আজ মহাকাশগবেষণা থেকে শুরু করে উপগ্রহযোগাযোগব্যবস্থা, বৃহৎশিল্পসংগঠন এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক শাখার সাথেই জড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব একটি রেখাচিত্র আমাদের জানা থাকলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা বুঝবার পক্ষে সুবিধা হবে।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রেখাচিত্র

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রগতির রেখাচিত্রটি আমরা প্রায় রোজই পেয়ে যাই সরকারি প্রচার-মাধ্যমে বা সংবাদপত্রে সরকারের "প্রগতি"র বিজ্ঞাপনের সূত্রে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সব ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি কত দুর্বার, তা পরিসংখ্যান তুলে সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যায়। আমরা জানি, স্বাধীনতার পর খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫০.৮ লক্ষ টন থেকে ১৪৬.২ লক্ষ টন ছাড়িয়ে গেছে, রপ্তানি-বাণিজ্য ৬০১ কোটি টাকা থেকে ১১,২৯৭.৩৮ কোটি টাকার উপর, ইস্পাতের উৎপাদন ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৭.৪ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। অথবা ১৯৬০-৬১ সালেও যেখানে বৈভব আর আভিজাত্যকে উশকে দেবার জন্য ২,৫৬,০০০ চারচাকার গাড়ি ভারতবর্ষের রাস্তায় চলাফেরা করত, আজ তা ৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এ-সমস্ত পরিসংখ্যানই দেশের অগ্রগতির স্মারক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমরা গর্ব বোধ করতে পারি।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আর অগ্রগমনের এই পরিসংখ্যানের পাশাপাশি আরেকটি চিত্রও আছে যা কখনোই সরকারি প্রচারমাধ্যম অথবা "প্রগতি"র বিজ্ঞাপনে আমরা পাই না। এবার সেইটি তুলে ধরছি। এই চিত্রে ভারতবর্ষের ৩৬ লক্ষ গ্রামের ৩০ কোটির উপর মানুষ নিয়ত দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকে কোনোভাবে জীবনধারণ করে বেঁচে আছে। ৩৩ কোটি ৪ লক্ষ মহিলার মধ্যে ২০ কোটির উপর মহিলার দুবেলা পেট পুরে খাবার জোটে না। আজ দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৪০ কোটির উপর। অবশ্য দেশের এইসব মানুষের জন্য সামান্য খাদ্য, একটু পানীয় জল বা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা না গেলেও গ্রামে-গ্রামে প্রতিদিনই দূরদর্শনের প্রচারসূচী সম্প্রসারিত হচ্ছে, এবং স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন একসচেনজ বসছে।

১৯৫০-৫১ সালেও যে দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২,৩৩ কোটি টাকা, আজ তা বেড়ে হয়েছে ১৯,০০১৩৯ কোটি টাকার উপর। ১৯৭০ সালেও স্বনির্ভরতার নামে বিদেশের সাথে যেখানে মাত্র ১৮৩টি "কোলাবরেশন" চুক্তি হয়েছিল, ১৯৮৪-তেই তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪০-টিতে। খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর (!) এই ভারতবর্ষেই ১৯৮৫তে ঘটে যায় 'কালাহাণ্ডির' মতো ঘটনা—যাকে সহজেই "প্রগতি"র কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস

ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি গবেষণায় যে বিপুল অর্থ আর মানবসম্পদ নিয়োজিত রয়েছে তার যুক্তি হিসাবে ভারত সরকার অনেকগুলি কারণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রধান দুটি হল : (১) ভারতবর্ষকে সবক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া, (২) বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটানো।

ভারত সরকারের এই যুক্তি কতটা ঠিক, এবং তার ফলে স্বনির্ভরতা আর ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা কতটা এগিয়েছি, তা দেখা যাক।

ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে ১৩০০-র উপর বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি গবেষণাকেন্দ্রে ৩০ লক্ষ মানুষ কর্মরত। এর মধ্যে ৫'৪১ লক্ষ গবেষক সরাসরি গবেষণায় যুক্ত। ভারতবর্ষের মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) ০'৬৬% ব্যয় হচ্ছে গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য। কিন্তু এই-সমস্ত গবেষণাগার আর গবেষকরা জাতীয় শিল্প উৎপাদনে স্বপ্রযুক্তি হস্তান্তর (indigenous know-how transfer) করেছেন মাত্র ০'০৮%। ভারতবর্ষ-এর শিল্পমানচিত্রে এখন ৬১৩২-টির বেশি বৈদেশিক সহযোগিতা-চুক্তি রয়েছে। এক কথায়, প্রায় সমস্ত শিল্পক্ষেত্রেই বিদেশীদের একচেটিয়া ভূমিকা কার্যকর রয়েছে। যেমন, কৃষিযন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৭০%, যানবাহন-শিল্পের ক্ষেত্রে ৬৫%, শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-নির্মাণের ক্ষেত্রে ৪৫%, এবং ঔষধ এবং ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে ৩৫%। এ ছাড়া দেখা যাচ্ছে, একমাত্র ১৯৭৩ সালেই technological assimilation effort সবথেকে বেশি—যা ৩'১০ ভাগ। এরপর থেকে তা দ্রুত অবনতির দিকে।

এ ছাড়া ভারত সকার ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলছেন। কিন্তু শিল্পে উন্নত আমেরিকাতেও স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রশ্নে বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তি মাত্র ৪০% সম্পর্কিত। বাকি ৬০% নির্ভর করছে মানবসম্পদের দক্ষতার উপর। বিশিষ্ট মার্কিন অর্থ-নীতিবিদ কনড্রিক, সোলোন এবং এবং ডেনিসন তাঁদের প্রতিবেদনে বলছেন, বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তি গবেষণায় যত টাকাই ব্যয় করা যাক না কেন,

উৎপাদনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর অবদান ওই ৪০% মাত্র। এ তথ্যটি ড. এ. এস. গাঙ্গুলিও ১৫. ৫. ১৯৮৭-তে উল্লেখ করেছেন—হিন্দুস্থান লিভারের বার্ষিক রিপোর্টে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ড. এ. এস. গাঙ্গুলি বহুজাতিক সংস্থা হিন্দুস্থান লিভারের ভারতীয় প্রধান, এবং প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা কমিটির একজন সদস্য।

উপরের আলোচনার সূত্রে দুটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি। এক, ভারত সরকার স্বনির্ভরতা এবং ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তির কথা বারংবার বলছেন—তা কতটা ভ্রান্ত এবং বিপথে চালিত। দুই, বিজ্ঞান বা উচ্চপ্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য—অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসীর কল্যাণের জন্যও। ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এর অন্যথা হলে হিতে বিপরীত হবে। আর হচ্ছেও তাই। উচ্চপ্রযুক্তির নামে বিদেশ থেকে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করে যে প্রযুক্তিজ্ঞান আমরা নিয়ে আসছি, তার ফলে না হচ্ছে উৎপাদনবৃদ্ধি, না হচ্ছে ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত শ্রমভাণ্ডারের যথাযথ ব্যবহার। যেমন, ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর ব্যবহার। আবার দেখা যাচ্ছে, একই শিল্পের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি গ্রহণ করছি। তর্ক না করে ধরে নেওয়া যাক, বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেরা প্রযুক্তিই আমরা গ্রহণ করছি। কিন্তু এই বিভিন্ন প্রযুক্তির সামঞ্জস্য বিধান করে ভারতীয় পরিমণ্ডলে তার সদ্ব্যবহার তো আমাদেরই করতে হবে। তা হচ্ছে কোথায়? যেমন ইস্পাতশিল্পে। আমরা রাশিয়া, জারমানি, ব্রিটেন, জাপান এবং অন্যান্য দেশ থেকে নিয়ত প্রযুক্তি কিনে চলেছি। তার ফলেই কি ইস্পাতশিল্পে প্রতি বছর কোটি-কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছি? বিষয়টি ভেবে দেখবার সময় এসেছে। সময় এসেছে পুনরমূল্যায়নের। বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তির নামে কেন আমরা হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয় করব? সময় এসেছে বিশ্লেষণ করার, কেন স্বনির্ভরতার নামে আমরা প্রতিদিন আরো বেশি বিদেশী সহযোগিতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ব?

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান গবেষণার বিষয়টি আমাদের বিচার করতে হবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস - বিজ্ঞানের গবেষণা ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এখন যা চলছে তা হল, বিদেশ থেকে আমদানি-করা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এবং কমপিউটারের বহুল ব্যবহার। অবশ্য বিদেশী প্রযুক্তি-সহযোগিতায় এদেশেও এজাতীয় কিছু-কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি শুরু হয়েছে। কেন, কোন্ পরিস্থিতিতে ভারত সরকার এই বিশেষ উচ্চ-প্রযুক্তিটি ভারতবর্ষে ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন, তার জটিল আলোচনায় এখানে আমরা প্রবেশ করছি না। কেবল বলা যেতে পারে—ভারত সরকার যে দ্রুততায় এই কাজটি সম্পন্ন করে চলেছেন, তার তুলনা আজ পর্যন্ত অন্য কোনো ক্ষেত্রে আমরা পাই নি। ভারত সরকার এরই মধ্যে সমস্ত বৃহৎ শিল্পে আর সরকারি সংস্থায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা করছেন। যত্রতত্র নির্বিচার কমপিউটার বসিয়ে চলেছেন। প্রতি বছর কমপিউটারের ব্যবহার কী ভাবে বাড়ছে তা জেনে নিলেই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মাইক্রো-কমপিউটার ব্যবহার হয় ১,২০০টি এবং মিনি কম-পিউটার ২৯০টি। ১৯৮৪-৮৫ সালে যথাক্রমে ২,৬০০ এবং ৫৫০; ১৯৮৫-৮৬ সালে ১০,৩৫০ এবং ১,০৯৮। এখানে যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হল, সাইবার-নেটিকস-বিজ্ঞান গবেষণার নামে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের কমপিউটারের ব্যবহার বাড়ছে—ব্যাপক-ভাবেই বাড়ছে। পরবর্তী পর্যায়ে 'সুপার কমপিউটার' সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলছে—যেন ভারতবর্ষের সামগ্রিক অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে আছে সুপার কম-

পিউটারের জন্য! সুতরাং ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনামূলত কমপিউটার ব্যবহারের মধ্যেই এখনও সীমাবদ্ধ।

উচ্চপ্রযুক্তি তথা কমপিউটার ব্যবহার এবং কিছু প্রশ্ন

উচ্চপ্রযুক্তি তথা কমপিউটার ব্যবহারের ফলে ভারত-বর্ষের জনজীবনে যে পরিবর্তনগুলি হয়ে চলেছে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিবর্তনগুলি গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যে পরিবর্তনগুলি সূচিত হচ্ছে, এবার আমরা তা উল্লেখ করব।

১. উচ্চপ্রযুক্তি তথা কমপিউটার, না শ্রমনিবিড় প্রকল্প?

বর্তমানে ভারত সরকার-ঘোষিত বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। তারপর রয়েছে অঘোষিত আরো কয়েক কোটি বেকার—অর্ধবেকার, গ্রামীণ বেকার, নথি-বহিরভূত বেকার। এ ছাড়া, বিভিন্ন শিল্পে আর সরকারি সংস্থায় যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরাও বেকার হয়ে পড়ছেন শিল্পসংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অথবা ছাঁটাইয়ের কারণে। এই অবস্থায় ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন—সমস্ত বৃহৎ শিল্পে এবং সরকারি সংস্থায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করার—অর্থাৎ কমপিউটার বসাবার। এবং দ্রুত সে সিদ্ধান্ত কাজেও পরিণত করে চলেছেন। কমপিউটারের ব্যবহার কী ভাবে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। এর ফলে একদিকে যেমন বড়ো-বড়ো সংস্থাগুলিতে দ্রুত কর্মী-সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে নতুন এমন কোনো ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে না যেখানে সদ্য-কর্মচ্যুত বেকারদের বা নতুন বেকার-বাহিনীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। যেমন, ভারতীয় রেলের কথা ধরা যাক। ভারতবর্ষে কর্ম-সংস্থানের দিক থেকে রেল সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের সময় এই সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। আজ সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ লক্ষে। ১৯৯২ সালের শেষে এই সংখ্যা হবে ৯ লক্ষ। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৫০ হাজার করে কর্মী কমিয়ে আনা হয়েছে, এবং তা হবে আরও কয়েক বছর ধরে। রেলে এভাবে কর্মী-সংখ্যা কমিয়ে আনা হচ্ছে প্রধানত কাজের প্রতিটি বিভাগে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করে বা কমপিউটার বসিয়ে। এ ছাড়া, পুরনো দেশীয় পদ্ধতি বাতিল করে বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহারও এর অন্যতম কারণ। রেল ছাড়া ব্যাঙ্ক, ইস্পাত, তেল, কয়লা সহ সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগেও এই ব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপক আকারে কার্যকর হচ্ছে। সরকারি সংস্থার সাথে-সাথে বিভিন্ন ছোটো-বড়ো বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে চলেছে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে। যেমন, বিদেশী ব্যাঙ্ক-শিল্প সমস্ত কাজ পরিচালনায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এমনভাবে কার্যকর করেছে যে শুধু কর্মী-সংখ্যাই কমছে না, এর সাথে তাদের ব্যাবসাও বিপুলভাবে বাড়ছে। যেখানে সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্ক-শিল্প ৫০,০০০ শাখা নিয়ে কাজ করছে, সেখানে বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা মাত্র ১৫০টি। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির অনেক শাখাতেই এখন ২৪ ঘণ্টা ব্যাঙ্কিঙের কাজ চলছে (round the clock banking functions)। তারা ATM (automatic teller system) ব্যবস্থা এমনভাবে চালু করেছে যার মাধ্যমে একজন গ্রাহক তাঁর কাজকর্ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেই করে নিচ্ছেন। আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থা তাদের সমস্ত শাখাতেই চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকী সিটি ব্যাঙ্ক ATM ব্যবস্থা হাসপাতালে, রেল স্টেশনে, বিমান-বন্দরে চালু করার প্রস্তাব রেখেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে। এ ছাড়া, একটি শাখাতে অ্যাকাউনট থাকলে গ্রাহক সেই ব্যাঙ্কের যে-কোনো শাখা থেকে টাকা

সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। আপাতত এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট-শহরকেন্দ্রিক হলেও, ক্রমশ তা আন্তঃরাজ্য থেকে আন্তর্দেশীয় করার পরিকল্পনা বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির রয়েছে। সবশেষে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি যে প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসছে তা হল, push-buttom banking service। এই ব্যবস্থা অনুসারে সরাসরি গ্রাহকদের অফিসের সাথে ব্যাঙ্কের যান্ত্রিক যোগাযোগের মাধ্যমেই কাজ চলবে। গ্রাহককে দৈনিক কাজকর্মের জন্য ব্যাঙ্কে আসতে হবে না। এর ফল হিসাবে, বিদেশী ব্যাঙ্কের গ্রাহকসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে আমানতের পরিমাণ। গত ৩০ মাসে সিটি ব্যাঙ্কে NRI ডিপোজিট ২৭ কোটি টাকা থেকে ৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিদেশী ব্যাঙ্ক-শিল্পের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-শিল্পও এক ব্যাপক স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এ পরিকল্পনার কিছু অংশ এরই মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, বাকি অংশও দ্রুত বাস্তবায়িত হতে চলেছে। বর্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-শিল্পে ৬ লক্ষ কর্মী রয়েছেন, কিন্তু ২০০১ সালের মধ্যে এই কর্মী-সংখ্যা মাত্র ৯০ হাজারে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা ভারত সরকারের রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বেশ-কিছু শাখাও বন্ধ করে দেবার চিন্তা ভারত সরকার করছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উচ্চপ্রযুক্তি, বিশেষ করে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পে এবং অন্যান্য সংস্থায় কর্মী-সংখ্যা দ্রুত হারে কমবে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলবে নতুন-নতুন বেকারবাহিনী।

কর্মসংকোচনের এই সমস্যাকে আড়াল করা হচ্ছে উৎপাদনশীলতার কথা বলে। বারংবার একই কথা উচ্চারিত হয়ে চলেছে যে নতুন-নতুন উচ্চপ্রযুক্তি এবং কমপিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে উৎপাদন বাড়াবার জন্য। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রশ্নে উচ্চপ্রযুক্তি মাত্র ৪০ ভাগে জড়িত; বাকি ৬০ ভাগ মানুষের দক্ষশ্রমের উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া, উচ্চপ্রযুক্তি বিশেষ করে কমপিউটার ব্যবহারের প্রশ্নে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও বিবেচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে ভারতবর্ষ সুলভ শ্রম-সম্পদে ভরপুর, যে ভারতবর্ষে কোটি-কোটি বেকার, সেখানে উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প আমরা গ্রহণ করব, না, সুলভ শ্রমনির্ভর প্রকল্প—প্রশ্নটা এখানেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল—অবশ্যই শ্রমনির্ভর প্রকল্প। যেখানে উচ্চপ্রযুক্তি একান্ত প্রয়োজন, সেখানে অবশ্যই তা মেনে নিতে হবে। তাতে কোনো বিরোধও নেই। কিন্তু আমাদের সব সময়ই গুরুত্ব দিতে হবে নিবিড়শ্রমনির্ভর প্রকল্পে। যতদিন ভারতবর্ষে ভয়াবহ বেকারসমস্যা রয়েছে, যতদিন উচ্চপ্রযুক্তি আর কমপিউটার ব্যবহারের পরিবেশ না গড়ে উঠছে, ততদিন এর বিকল্প কোনো পথ অনুসন্ধান করা বৃথা চেষ্টায় পর্যবসিত হবে।

২. শ্রমিকশ্রেণীর নতুন মূল্যবোধ

উচ্চপ্রযুক্তি-নির্ভর নতুন-নতুন প্রকল্পে যাঁরা কাজ পাচ্ছেন, তাঁদের মজুরি স্বাভাবিক কারণেই বেশি। যেমন পেট্রকেমিক্যালস, নতুন বিদ্যুৎউৎপাদনকেন্দ্র। আবার পুরনো প্রকল্পেও উচ্চপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ব্যাপক হারে কর্মী কমে গিয়ে অবশিষ্ট যাঁরা থাকছেন তাদের আয়ও কিছু বাড়ছে। যেমন রেলে বা কোনো-কোনো সরকারি সংস্থায় বোনাস চালু হওয়া। যদিও এই বাড়তি আয় পণ্যমূল্যের সূচক অনুসারে অবশ্যই কম। উভয় ক্ষেত্রেই যাঁরা কর্মরত তাঁরা মূলত শ্রমিক। এই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নতুন কিছু মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। কেবল আয়ের বৈষম্যের কারণেই তা গড়ে উঠছে না; তাঁরা যুক্ত হয়ে পড়ছেন "লোয়ার অ্যারিস্টোক্রেসি"র সাথে। ফলে, ছোটো মাঝারি এবং অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের সাথে তাঁদের এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। এই ব্যবধান যে আগে ছিল না তা নয়; তবে এখন তা আরো বাড়ছে—দ্রুত হারে বাড়ছে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক ঐক্যের প্রসার করে সমাজবিপ্লবের চিন্তা আর চেতনা বিভিন্ন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে সংগঠিত বৃহৎশিল্পে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা দ্রুতভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে; তাঁরাও হয়ে পড়ছেন পণ্য-সমাজের অংশীদার।

এর সাথে আরো একটি বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি প্রয়োজন। তা হল: উচ্চ আয়ের (হাই-পেড) শ্রমিকরা ক্রমশ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিল্পমূলধনের সাথে নিজেদের স্বার্থের সম্পর্ক দৃঢ়তর করে তুলছেন। এই শ্রমিকরাও আজ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনছেন। নিজেদের নামে না হলেও পরিবারের অন্য কারো নামে। এর বিভিন্ন ব্যতিক্রমী উদাহরণ অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে, তবে তা সংখ্যায় সামান্যই হবে। তাই কিছু প্রতিষ্ঠান সদম্ভে ঘোষণা করছে, আমাদের শেয়ারহোলডারের সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে ১০ লক্ষে পৌঁছল; পরবর্তী লক্ষ্য ২০ লক্ষে পৌঁছানো। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, কোনো প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের সাথে ওই ৫, ১০ বা ২০ লক্ষ শেয়ারহোলডারের সম্পর্ক জড়িয়ে পড়ছে—শেয়ার-হোলডারদের অংশীদারির পরিমাণ যত কমই হোক। যদি কখনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে সরকারকে ঐ ৫, ১০ বা ২০ লক্ষ মানুষের বিপক্ষে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় শিল্প-মূলধন এইভাবেই নিজদের স্বার্থে উচ্চআয়ের শ্রমিক-দের শিল্প-মূলধনের সাথে জড়িয়ে রাখছেন। আর আমরাও দেখতে পাচ্ছি এই শ্রমিকরা আজ শিল্প-মূলধনের পৃষ্ঠপোষক। আরো স্পষ্ট করেও বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় শিল্প-মূলধনের স্বার্থরক্ষায় এই শ্রমিক-শ্রেণী আজ বড়ো বেশি সচেতন।

৩. কমপিউটারের সামাজিকীকরণ

ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক হারে কমপিউটারের ব্যবহার শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, জাতীয় স্বার্থের পরি-পন্থীও বটে। কিন্তু ব্যাপক হারে কমপিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে, কর্মরত শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন; নতুন কাজের সুযোগ আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এর বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদের স্তর পেরিয়ে, দিন কয়েকের ধরনা বাদ দিয়ে সংগঠিত কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন অনুপস্থিত। বরং আজ যাঁরা মৌখিক-ভাবেও প্রতিবাদ করছেন কাল তাঁরাই কমপিউটারের সপক্ষে "ঐতিহাসিক চুক্তি"গুলি সই করে আসছেন। কেন তাঁরা চুক্তিগুলি সই করতে বাধ্য হচ্ছেন?

কারণ, ট্রেড ইউনিয়নের "সাদা রঙের" শ্রমিক-প্রতিনিধিরা এর বিপরীত কিছু করার নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। এবং বর্তমান শাসকশ্রেণীও নিজেদের স্বার্থে কমপিউটারের ব্যবহারের সামাজিকী-করণ করে ফেলেছেন। কেন তাঁরা নৈতিকতা হারালেন? কীভাবে শাসকশ্রেণীই বা সামাজিকী-করণ করে ফেললেন?

এর উত্তরে বলা যায়, একদিন ঔপনিবেশিক সরকার যে প্রথা-প্রকরণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার সামাজিকীকরণ করেছিলেন, সেই একই কায়দায় বর্তমান শাসকশ্রেণীও কমপিউটারের ব্যবহারকে সামাজিকীকরণ করে ফেলেছেন। যে কারণে অলিতে-গলিতে "ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল" গড়ে ওঠে, সেই একই কারণে এখন Computer Training Centre গড়ে উঠছে। ইংরেজি জানা যেমন আর্থিক উন্নতির সোপান হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং হয়, তেমনি সমাজে ওজন ভারী (social poise) করবার প্রয়োজনও দরকার। এখন "কমপিউটার কালচার"-এর সাথে জড়িয়ে পড়াও একান্ত প্রয়োজনীয়—কারণ একই। আর্থিক উন্নতি ও সমাজে ওজন ভারী করা। এই জড়িয়ে পড়ার সুযোগটা গ্রহণ করছেন মূলত সমাজের সেই অগ্রসর শ্রেণী—যাঁরা মৌখিকভাবে এখনও ইংরেজিবিরোধিতা

করে নিজেদের সন্তানসন্ততিদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলেই পড়ান। সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা, সেই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি! ফলত, কমপিউটার ব্যবহারের বিরোধিতা করার নৈতিকতা আজ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা হারিয়ে ফেলেন। তাদের ছেলেমেয়েরাও অনেকের আগে গিয়ে কমপিউটার কালচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এইভাবেই শাসকশ্রেণীও কমপিউটারের ব্যবহারকে সামাজিকীকরণ করে ফেলেছেন।

এ ছাড়া দেখা গেছে ঔপনিবেশিক আমলেও ভারতবর্ষের সামগ্রিক অনগ্রসরতার, বিশেষ করে আর্থিক সংকটের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্ধকারময় সেই ভুবনকে, যেখানে ইংরেজি ভাষা নেই, পাশ্চাত্যের জীবনবোধ নেই, নেই পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিজ্ঞান। আজকেও দেশের সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে উচ্চপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রায়োগিক কৌশলের অভাবকে। যেন আজকের ভারতবর্ষের সামগ্রিক অধোগতির একমাত্র কারণ উচ্চপ্রযুক্তির অভাব। এবং ভাবখানা এমন, যেন এর দ্বারাই ভারতবর্ষের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। আসলে ওই সেই প্রহেলিকা—যার সাহায্যে আজকের শাসকশ্রেণীও সমস্যার মৌলিক কারণগুলি ঢেকে রাখতে চাইছেন। মূল সংকটকে আড়াল করার এই কৌশল শাসকশ্রেণী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করে চলেছে। আর প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি এবং সংগঠিত বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকরা তার দোসর হয়ে পড়ছেন।

৪. জীবনের গুণগত মান কমছে, কম হলেও বাড়ছে জীবনযাত্রার মান

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পে আর প্রতিষ্ঠানে যেসব সংগঠিত শ্রমিক কাজ করে চলেছেন তাঁদের অনেকেরই শ্রেণীচেতনা ক্রতলয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়ে-যাওয়া শ্রেণীচেতনার পাশাপাশি গড়ে উঠছে ভিন্নতর মূল্যবোধ বা আদর্শ। এই ভিন্নতর মূল্যবোধ বা আদর্শকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে যে, ওইসমস্ত শ্রমিকদের জীবনে এখন মূল আদর্শ হল—পণ্যসমাজের আদর্শ, পণ্যসমাজের মূল্যবোধ। এখানে প্রথম আর শেষ কথা হলে কে কত বেশি পণ্য ভোগ করছে, কত দামি পণ্য ভোগ করছে, কত রঙবাহারি পণ্য ভোগ করছে। এই ভোগ্যপণ্যের সংখ্যায় আর ওজনে নির্ধারিত হচ্ছে জীবনযাত্রার মান। এই হিসাবে ভারতবর্ষের শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বাড়ছে, সংখ্যায় তারা যতই অল্প হোক। শুধু ওই শ্রমিকশ্রেণীই নয়, তার সাথে আমরা যুক্ত করতে পারি ভারতবর্ষের আরও ১০ বা ১১ শতাংশ মানুষকে—যাদের জীবনযাত্রার মানও বাড়ছে। এরাই সমাজের সেই অগ্রসরশ্রেণী যারা উচ্চপ্রযুক্তির অংশীদার। এই ১২ বা ১৩ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান যে বাড়ছে তার প্রমাণ ভারতবর্ষে বিলাসবহুল ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ছে। বাড়ছে চারচাকার গাড়ির উৎপাদন আর চলছে পাঁচতারা হোটেলের আয়োজন। পরিশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে—এখন পর্যন্ত এই সামান্য-সংখ্যক মানুষই কিন্তু ভারতবর্ষের মূল নিয়ন্তা।

কিন্তু উচ্চপ্রযুক্তির অংশীদার এই শ্রেণীর জীবনের গুণগত মান (কোয়ালিটি অব লাইফ) কমছে। কোথাও-কোথাও গুণগত মান দ্রুতহারে কমছে। এখানে এ-বিষয়ের জটিল ব্যাখ্যায় আমরা প্রবেশ করছি না। জীবনের গুণগত মান যে কমছে তার সরল প্রমাণ সৃষ্টিকর্মের যে-কোনো আঙিনা থেকে নেওয়া যেতে পারে। বা প্রমাণ করা যেতে পারে আজকের চলমান রাজনীতির গুণগত মান থেকেও। যেমন, মূল্যবোধের রাজনীতি (value-based politics)। বর্তমান রাজনীতিতে "নীতি", "মূল্য-বোধ", "সততা" প্রভৃতি বিষয়গুলি অতীতের বিষয় হয়ে পড়ছে—একদম বিচ্ছিন্ন উদাহরণ ছাড়া।

ফিলমি পরদার নায়ক আজ ভারতবর্ষের রাজনীতির মঞ্চে উঠেছে। এখন রাজনীতির অর্থ, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এও তো সত্যি যে তেলেঙ্গানার ঐতিহ্যে গরীয়ান অন্ধ্রপ্রদেশে পরদার 'এতো নায়ক' কত সহজে রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসেন। এ-ঘটনা রাজনীতির কোন্ গুণগত মানকে চিহ্নিত করে?

তথ্যসূত্র

১. Ashby, William R. (1968) An Introduction to Cybernetics.
২. Maron, M. E. (1965) On Cybernetics Information Processing and Thinking.
৩. Union Budget 1987-88; 1988-89 & Budget Speech.
৪. Census of India 1971 & 1981.
৫. The Economic Scene—January 1987.
৬. India—A Reference Annual Different Years, Publication Division. Government of India.
৭. Fourth Survey Report on Foreign Collaboration by RBI & other sources.
৮. Govindarajula V.—Evaluation of Effectiveness of Indigenous R & D. Journal of Scientific & Industrial Research (Vol. 43).
৯. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা।
১০. ভারতীয় পটভূমিতে সাইবারনেটিকস।
১১. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিস প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন।
১২. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস—কিছু জিজ্ঞাসা।
১৩. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস কেন?

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

(খ)

বহিঃপ্রাসাদের বিলাসকক্ষে আমোদপ্রমোদ লেট-ঠোন-ড' কথা

রাত্রিতে ছয়টি বেলোয়ারির ঝাড়, চব্বিশটি বড়ো মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোকে লেট-ঠোন-ড' স্বর্ণমণ্ডিত প্রাচীর ভাস্বর থাকিত। প্রত্যেক বাতায়নের সম্মুখে পুষ্পিত হাসনাহানা, রজনীগন্ধা ও চামেলির টব বসানো ছিল। গৃহতলে বহুমূল্য কার্পেট বিছানো ছিল; তাহার উপর কয়েকখানি ফরাসি-দেশীয় বার্নিশোজ্জ্বল কুর্সি, তাহাতে স্প্রিঙ-দেওয়া মখমলের কুশন এবং রাজার জন্য ব্রহ্মদেশীয় সূত্রধরনির্মিত সুচারু কারুকার্যসম্পন্ন স্বর্ণপত্রমণ্ডিত কেদারা ছিল। প্রত্যেক কুর্সির সম্মুখে এক-একখানি আবলুশ কাঠের শিল্পকার্যময় পীঠিকা ছিল। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক কুর্সির নিকট ছিল এক-একটি রৌপ্যনির্মিত নিষ্ঠীবনী। চারি প্রাচীরে চারিখানি সুবৃহৎ দর্পণ; প্রতি দর্পণের দুই পার্শ্বে দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত সিংহমূর্তি; তাহাদের শিরোদেশে এক-একখানি স্বর্ণনির্মিত থালা; তাহার উপর কতক-গুলি সুগন্ধির শিশি এবং ছোটো একটি স্বর্ণপাত্রে চন্দনের তরল প্রলেপ। বেলোয়ারি ছোটো-ছোটো ফুলদানে ছোটো-ছোটো কয়েকটি পুষ্পগুচ্ছ।

হস্তিদন্তের একখানি ক্ষুদ্র পর্যঙ্কে একটি ছোটো "জাহাজি কুকুর" বসিয়া থাকিত। কুকুরটি আনা হইয়াছিল মহারানী থুপিয়ালার জন্য। কিন্তু মহারানীর পারস্যদেশীয় বিড়ালীর সহিত জাহাজি কুকুরের সদ্ভাব না হওয়াতে, মহারাজ তাহাকে লেট-ঠোন-ড' কক্ষে স্থান দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র তাহার মুখ; উজ্জ্বল তাহার সুবৃহৎ দুটি চক্ষু; অঙ্গে দুগ্ধফেননিভ দীর্ঘ রোমরাজি; আকারে ক্ষুদ্র একটি শূকর-শিশুর মতো; হৃষ্টপুষ্ট কোমল কলেবর ছিল। নরম গদি ভিন্ন অন্যত্র এ জাহাজি কুকুর শয়ন করিত না; দুর্গন্ধহীন চৈনিক প্লেট ভিন্ন অন্য পাত্রে অন্ন গ্রহণ করিত না; ব্রহ্মের রাজপ্রাসাদে আসিয়া সে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া-

ছিল—নিরামিষ ভোজন করিত। পূর্বাহ্নে মহারাজার সহিত বেলা বারোটার পর নির্জলা উপবাস করিত; কুঙ্গী চাউংয়ে প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিলেই জাহাজি কুকুর বিলাসকক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পুচ্ছ নত করিয়া সম্মুখের দুই পদ ঊর্ধ্বে তুলিয়া হা-আ-আ-আ শব্দে "স্তোত্রপাঠ" করিত। মহারানীর বিড়ালটির সহিত অদৃষ্টক্রমে সাক্ষাৎ হইলে পুচ্ছ আধুনন করিয়া, দেহ আকুঞ্চন করিয়া, যে মধুরভাবে সে বিড়ালীর সহিত প্রেম করিতে যাইত, বিড়ালীর তাহা মোটেই সহ্য হইত না। সে পৃষ্ঠদেশ রামধনুর মতো বক্র করিয়া, মোটা লেজটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া এমন এক বিকট মুখভঙ্গি করিত যে জাহাজি কুকুরের প্রেম তখনি বাষ্পীভূত হইয়া যাইত। তিব'র প্রতি মহারানীর আদেশ ছিল—'কুকুরকে অন্দরমহলে আনিও না।' কিন্তু মহারানীর মানভঞ্জনের রাত্রিতে মহারাজ তিব' এ আদেশ অমান্য করিয়া কুকুরটিকে মহারানীর কক্ষে লইয়া আসিতেন। কুকুর আর বিড়ালীর প্রণয়কলহে রাজদম্পতির দাম্পত্যকলহও 'লঘুক্রিয়া' হইয়া যাইত।

বিলাসকক্ষের দেওয়াল ছিল উজ্জ্বল পরিষ্কার দর্পণবৎ। কিন্তু রাত্রিকালে এক জেটিকা-দম্পতি কক্ষের স্নিগ্ধ আলোকে প্রাচীরের গাত্রে আহার অন্বেষণে আবির্ভূত হইত। মহারাজ তিব' দয়া করিয়া তাহাদিগকে 'আতে-সিন' উপাধি দিয়াছিলেন। 'আতে-সিন-মিন' উপাধি ছিল মহামন্ত্রী কিন-টন-মিনজীর। মিনডন মহারাজ-প্রদত্ত উপাধি; তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইত না। নারায়ণ মুখার্জি নামক এক সাধু-মহারাজ তিব'র দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; উ-টিনকৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে নারায়ণ মুখার্জির আবির্ভাবের কথা লিখিত আছে। তিনি তিব' মহারাজকে বলিয়াছিলেন : 'টিকটিকিরা খনার বাচ্চা—গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নের সরল সমাধান করিতে পারে—মনে সন্দেহ থাকে না।'

মহারাজ মিনডনের রাজদরবারে এক অলঙ্কার ছিল—তাঁহার বিদূষক। মহারাজ তিব'র সময়ে সে পেনশন লইয়াছিল। তাহার স্থানে কোনো বিদূষক নিযুক্ত হয় নাই। বিলাসকক্ষে একাব্বর মিন্‌তা বিদূষকের অভিনয় করিলেন, কিন্তু তাহা মধ্যভাবে গুড়বৎ।

বিলাসকক্ষে একদিন বেশ আসর জমিল। ইয়ে-নাউং-মিন্‌তা, পাগান মিন্‌তা, একাব্বর মিন্‌তা, ও পিন্‌তা-মিন্‌তা প্রভৃতি সকল বন্ধুরাই সে রাত্রিতে বিলাসকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। বেলোয়ারির পেয়ালায় ফেনশীর্ষ শ্যাম্পেন ক্ষণে-ক্ষণে পরিবেশিত হইতেছিল। অতুল আনন্দে, উন্মত্ত হাস্যে ও অর্ধজড়িত বাক্যে প্রমোদকক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল।

পিন্‌তা মিন্‌তা বলিলেন—মান্দালয় পর্বতে আজ একটি খুব বড়ো তেহার। বড়ো-বড়ো কুঙ্গী আর অগণ্য পূজার্থীর সমাগম হইয়াছে।

একাব্বর—পূজার্থিনীর সংখ্যাই বেশি।

ইয়েনাউং—ব্যাপারটা কী?

তিব'—ব্যাপার—মং-ইয়ে নামক এক ভণ্ড সাধু মান্দালয়ে আসিয়াছে! সে বলিতেছে—প্রভু গজার মৎস্য আকাশপথে মান্দালয় পাহাড়ে উড়িয়া আসিবেন।

ইয়েনাউং—ব্যাটা ভয়ানক ফাঁকিবাজ বদমায়েশ। মহারাম মিন্‌ডনের সময়েও সে একবার আসিয়াছিল।

একাব্বর মিন্‌তা ডাঃ মার্কের বিদ্যালয়ে হ্যামলেট পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—There are things, Horatio, that your philosophers cannot dream। হয়তো তাহার কথা সত্যও হইতে পারে।

তিব'—সে বলিতেছে, বৈশালী শহরের অতি পুরাতন এক পানাপচা পুকুরে প্রভু গজার মৎস্য বাস করিতেন। এক ইংরেজ হুইশকি পান করিয়া প্রভুর গায়ে কুলকুচা করাতে তিনি অভিশাপ দেন যে তিনদিনেরমধ্যেই কালার বাচ্ছার মৃত্যু হইবে। সত্যই তাহা হইল। তাহার পর প্রভুজী মংইয়েকে

স্বপ্নাদেশ দিলেন: 'আমি আর বৈশালীতে থাকিব না, মান্দালয় পাহাড়ে বাস করিব। তুই রাজধানীতে খবর দে।' ব্যাটা এই উপলক্ষে মান্দালয়ে এক মহাপর্ব খুলিয়া বসিয়াছে।

ইয়েনাউং—মহারাজকেও সে দর্শন দিয়াছিল নাকি?

তিব'—দর্শন দেয় নাই, কিন্তু দর্শন চাহিয়াছিল। আমি সম্মত হই নাই।

পিন্‌তা—মাছ কখনো শূন্যে উড়িতে পারে? ব্যাটা তো ভারি ধড়িবাজ।

তিব'—কোনো-কোনো মাছ পারে, কিন্তু গজারমাছ পারে না। পিন্‌তা মিন্‌তা—তোমার এঞ্জি?

ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া রাজসভায় আসা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পিন্‌তা-মিন্‌তার এঞ্জির পুরাতন এক অংশে এক ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। ছিদ্রটিকে পিন্‌তা-মিন্‌তা বাম হস্তে আবৃত করিয়া কহিলেন—

—হুজুর, আমার এঞ্জির পকেট ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাজেই কোট পাজো সবই এখন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। মহারাজের দয়া ভিন্ন এ ছেঁড়া এঞ্জি বদল করা যাইতেছে না।

ইয়ে নাউং মিন্‌তা হাসিয়া বলিলেন—যার গিন্নীর সংখ্যা রোজই বাড়িয়া যাইতেছে,—পিন্‌তার পকেট কেন, চুল পর্যন্ত ছিঁড়িয়া যাইবে।

তিব' ছিলেন খুব সদাশয় দয়ালু রাজা। তিনি তখনই বলিলেন—পিন্‌তা-মিন্‌তাকে মাসিক ত্রিশ টাকা জেয়াদাভাতার জন্য মন্ত্রীদিগকে অনুরোধ করিবেন।

একাব্বর মিন্‌তা বললেন—মহারাজ, আমারও কিছু বেতনবৃদ্ধির আদেশ হউক। আমি জীবনবীমা করিয়াছি; প্রিমিয়ামের পয়সা জুটিতেছে না। কোম্পানি বলিতেছে—আমার দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

টাউঙ-টা-মান-লে-ছা বলিলেন—আমি আগেই বলিয়াছিলাম, তুমি এই জীবনবীমার ঝঞ্ঝাটে প্রবেশ করিও না।

তিব'—তুমি জীবনবীমা করালে কবে?

একাব্বর মিন্‌তা—আজ প্রায় তিনমাস। একদিন এক আমেরিকান কালা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে এক চামড়ার ব্যাগ, চোখে বড়ো-বড়ো চশমা, খুব লম্বা চেহারা আর পরনে খুব দামি পোশাক। আমাকে বলিল, আমি জীবনবীমা করিলে আমার মৃত্যুর পর তাহারা একলক্ষ টাকা দিবে।

পিন্‌তা—মনি অর্ডারে, না, তারে?

ইয়েনাউং—এখনো পরলোকে মনিঅর্ডার পাঠানোর ব্যবস্থা হয় নাই। তার অন্য বন্দোবস্ত আছে। যত খ্রীষ্টান মরিতেছে, তাহারা ইহলোক ত্যাগ করিয়া রেসারেকশনের জন্য পরলোকে জমা হইতেছে। সেখানে তাহারা বিপুল কারবার খুলিয়াছে। বড়ো-বড়ো ব্যাঙ্ক করিয়াছে। টাকার অভাব কী? একাব্বর মিন্‌তা সুদে-আসলে লক্ষ টাকা পাইবেন। তিনি ভালোই করিয়াছেন। সেখানে ছোটো গিন্নীর সঙ্গেও দেখা হইবে।

একাব্বর—আরে, তুমিও দেখিতেছি পাগল হইলে। আমি মরিলে টাকা পাইবে আমার স্ত্রী, আমি নই।

ইয়েনাউং—কোন্ স্ত্রী? বড়ো না মধ্যম?

পিন্‌তা—বড়ো স্ত্রীই তাহার মালিক হওয়া উচিত।

ইয়েনাউং—কিন্তু মধ্যমার বয়স অল্প; তাহারই টাকার দরকার বেশি।

তিব'—ধর্মতত্ত্বে বলিতেছে, সব স্ত্রীই সমান অংশ পাইবে। কিন্তু আমেরিকান কোম্পানি ধর্মতত্ত্ব মানিবে তো?

ইয়েনাউং—এক লক্ষ টাকা! দুই সতীনে লড়াই হইলে কোম্পানিই সে-টাকা হজম করিবে। কিন্তু টাকাটা দিবে কে?

একাব্বর—কোম্পানি দিবে।

ইয়েনাউং—কোম্পানি তো আমি কিছুই দেখিতেছি না। একজন ফেরেব্বাজ কালা, কোম্পানির নাম দিয়া বড়ো এক সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

তাহার বা তাহাদের না আছে জমি না বাড়ি। একদিন রেঙ্গুন হইতে চম্পট দিলে, একাব্বর মিন্‌তা হায়-হায় করিয়া মৃত্যুলাভ করিবেন। কোম্পানি কে?

টাউং-টামান—আমি চিরদিনই ওই কথা বলিয়া আসিতেছি।

তিব'—মাসে কত টাকা তোমাকে প্রিমিয়াম দিতে হয়?

একাব্বর—হাজার টাকা। আমার সব টাকা এই প্রিমিয়ামের জন্য খরচ করিতে হইতেছে।

তিব'—কতদিন এইরূপে প্রিমিয়াম দিতে হইবে?

একাব্বর—দশ বৎসর।

তিব'—দশ বৎসরে একলক্ষ বিশ হাজার টাকা দিতে হইবে। পাইবে তুমি এক লক্ষ। তাহাও দশ বৎসর পরে। ভালো ব্যাবসা বটে। কিন্তু যদি তুমি এতদিন না বাঁচ?

একাব্বর—কোম্পানি একলক্ষ টাকা দিবে।

তিব'—তাহারা তো কেহই রেঙ্গুনে নাই। যদি টাকাটা না দেয়?

পিন্‌তা—দিবে কি করিয়া মহারাজ! ধরুন, একাব্বর দুই বছরে ২৪০০০ টাকা জমা দিলে, তারপর তাহার মৃত্যু হইল—

দেওয়ালের উপর টিকটিকি অমনি বলিয়া উঠিল—

ঠিক, ঠিক, ঠিক। তিব' মহারাজ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিলেন—শুনিলে কি দৈববাণী?

সকলে বিস্মিত নেত্রে টিকটিকিদম্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। একাব্বর মিন্‌তা বললেন:

—আমারও মনে সর্বদাই ওইরকম এক ভয় হইতেছিল, যেন বেশি দিন আর বাঁচিব না। সেই জন্য বীমা করিলাম।

ইয়েনাউং—আমিও রোজ স্বপ্ন দেখিতেছি—আমার জেল হইয়াছে। জেলের কোনো বীমা নাই?

তিব'—তোমরা হুইস্কি সেবা করো; তোমাদের ওরকম স্বপ্নের কোন মীনিং নাই। আমি দেখিতেছি, বীমা কোম্পানি করা একটি ভালো ব্যাবসা। কিন্তু কোম্পানির অংশীদার সব দেশী লোক হওয়া চাই, আর যাহারা বীমা করিবে তাহাদের স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকা চাই।

ইয়েনাউং—মহারাজ, আপনি জ্ঞানী পুরুষ হইয়াও এমন এক অসঙ্গত কথা কহিলেন!

তিব'—অসঙ্গত কিসে?

ইয়েনাউং—আজ স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে কাল যে মরিবে না এরূপ কিছু নিশ্চয়তা আছে? মরণটি সকলের চেয়ে বেশি নিশ্চিত হইলেও সবচেয়ে বেশি অনিশ্চিত।

তিব'—তা সত্য। যদি সকল বীমাকারীই একসঙ্গে অসময়ে মৃত্যুলাভ করে, তবেই কোম্পানির ক্ষতি, নতুবা—এ বেশ লাভের ব্যাবসা।

ইয়ে নাউং—মার্জনা করিবেন, মহারাজ, এ একটা ভয়ানক লেফাফা-দুরস্ত জুয়াখেলা। বিলাতি জুয়াচুরির খেলায় আমাদের যোগদান করার মতো বোকামি আর নাই।

তিব'—জুয়া বটে, কিন্তু এ জুয়াখেলায় কোম্পানির বেশি লোকসান হইবে না। যদি প্রত্যেক মাসেই নূতন-নূতন লোক জীবনবীমা করে, তবে তাহাদের টাকাতেই মৃত লোকের টাকা পরিশোধ করা যাইতে পারে।

টাউং টামান—আমি এইরকম এক দেশী কোম্পানি খুলিতে চাই। যদি মহারাজ কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

তিব'—কত জনকে অর্থ সাহায্য করিলাম তাহার অন্ত নাই। মনে আছে নারায়ণ মুখার্জির কথা?

ইয়ে নাউং—সে বেটা চোর, মহারাজার নিকট হইতে ৫০০০ টাকা লইয়া গিয়াছে, বলিয়াছিল ৫০,০০০ টাকার সোনা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

পিন্‌তা—তাহার নেড়া মাথা, গায়ের নামাবলী আর কপালের লম্বা ফোঁটা দেখিয়াই আমি সন্দেহ করেছিলাম—বেটা চোরের শিরোমণি!

তিব'—কিন্তু লোকটা খুব বিদ্বান, পালি ও সংস্কৃত অনর্গল বলিতে পারে। হাত দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ ঠিক-ঠিক পাঠ করিতে পারে। গুপ্তধন দর্শন করিতে পারে। তাহার উপদেশেই আমি মান্দালয় পাহাড়ের নিকটে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যের সোনা ও জহরত খুঁড়িয়া পাইয়াছিলাম।

টাউং টামান—ওরকম ক্ষমতা হয় লোকের যোগবলে।

পিন্‌তা—যোগের আশ্চর্য ক্ষমতা। শুনিয়াছি তিব্বতি যোগীরা শুদ্ধ যোগবলে মানুষকে অসাড় করিয়া রাখিতে পারে। হাতের বন্দুক হাতেই থাকিয়া যায়, ব্যবহার করা যায় না।

একাব্বর—বেশ কথা। এবার ইংরেজদের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাধিলে এক গাড়ি তিব্বতি যোগী আমদানি করা হইবে। তাহারা ইংরেজের বন্দুক, কামান সব বন্ধ করিয়া দিবে। তাহার পর আমরা যুদ্ধে নামিব।

ইয়ে নাউং—এসব আমার বিশ্বাস হয় না।

পিন্‌তা—বিশ্বাস হয় না কী? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি মন্ত্রবলে বন্দুকের গুলি পায়ে লাগিয়া হটিয়া যায়।

তিব'—ওটা মরানছাউং ফৌজির ভেলকিবাজি।

পিন্‌ডা—এখানো অনেক লোক আছে, যাহাদের শরীর অভেদ্য।

তিব'—রক্তমাংসের শরীর কি অভেদ্য হইতে পারে? যোগীদের সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলিতে পারি না। শাস্ত্রে বলে তাহা অভেদ্য।

ইহার পর কয়েক পেয়ালা মদ্যপান হইল।

টাউং টামাইং লে-জা বলিলেন—মহারাজ, আমি আর একটি বিবাহ করিব। এক সুন্দরী কন্যাকে আমি ভালোবাসিয়াছি।

ইয়ে নাউং—কে সে?

টাউং টামাইং—নামটি এখনো বলিব না। সে বলিয়াছে—আমার মতো সুন্দর, সুপুরুষ আর সে দেখে নাই।

ইয়ে নাউং—এত বড়ো মিথ্যা কথা যে বলে, তাহাকে বিবাহ করা বড়ো একটা ভুল হইবে। বিবাহ না হইতেই সে প্রবঞ্চনা করিতে শুরু করিয়াছে।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

তিব' বলিলেন—তোমরা কী করিয়া একজনের পর একজন সুন্দরী প্রণয়িনী সংগ্রহ কর, তাহা আমার ধারণা হয় না।

পাগান মিন্‌তা—মহারানী থুপিয়ালার মতো স্ত্রী যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই এরূপ কথা বলিতে পারেন। অন্যে বলিবে না, মহারাজ! আমি তো দেখিতেছি, আমারও অন্য একটি বিবাহ না করিলে চলিবে না। এ স্ত্রী লইয়া দিনরাত্রি একঘেয়ে জীবন সহ্য করা যায় না।

টাউং টামান—সত্যই মহারাজ, এরূপ জীবন অসহ্য। আমাদের মধ্যে ইয়ে নাউং মিন্‌তাই আদর্শ পুরুষ। ঘরে ৫২টি স্ত্রী, সকলেই অর্থবতী, সকলেই সুন্দরী, ভাগ্যবান মিন্‌তাকে খাওয়া-পরার চিন্তা করিতে হয় না।

ইয়ে নাউং—সকলেই সুন্দরী নয়, বন্ধু! আমি যেমন, তাহারাও তেমনি সুন্দরী। সকলেই সাদাসিধা স্ত্রীলোক। সুন্দরী যদি দেখিতে চাও, দেখিও মা-খিন্‌জীকে—লোকচক্ষুতে এমন সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

পিন্‌তা—আমি দেখিয়াছি, বন্ধু! সত্যই এমন রূপসী বালিকা ধরায় জন্মে নাই।

একাব্বর মিন্‌তা—হাঁ, মা খিন্‌জী সুন্দরী বটে; যেন একখানি দেবীমূর্তি।

ইয়ে নাউং মিন্‌তা—তা ছাড়া, লেখাপড়ায়? এমন পুস্তক নাই যাহা সে পাঠ করে নাই। ইংরাজিতে কন্‌ভেনটে সে বরাবর প্রথম স্থান পাইতেছে।

তিব'—কে সে কন্যা, বন্ধু?

ইয়ে নাউং—মন্ত্রী কানি মিনের কন্যা মা খিন্‌জী। রূপের তুলনা নাই, বিদ্যায়ও অতুলনীয়া; অত্যন্ত সরল ও সৎ-চরিত্রা বালিকা।

তিব'—বয়স কত?

পাগান—ষোলো-সতেরো হইবে। এখন আর তাহাকে বালিকা বলা যায় না। মহারাজ তাহাকে দেখেন নাই? সে মাঝে-মাঝে রাজপ্রাসাদেও আসে।

তিব'—আমি দেখি নাই।

একাব্বর—চলুন, একদিন কন্‌ভেন্‌ট পরিদর্শন করিতে গেলে মা খিন্‌জীকে দেখাইব।

তিব'—কন্‌ভেন্‌টে না গেলে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না?

ইয়ে নাউং—পাওয়া যায়! কিন্তু কানিমিনগঙ কন্যাকে খুব সাবধানে রাখেন। সে কখনই একাকী বাড়ির বাহির হয় না। [ক্রমশ

কাজী আবদুল ওদুদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

আজহারউদ্দীন খান্

কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই আমার আর-এক মনীষীর কথা মনে পড়ে যায়—যিনি নিজের জন্মভূমি ছেড়ে চলে গেলেন ঢাকায়, সেখানেই রয়ে গেলেন। ওদুদ সাহেব জন্মভূমি ছেড়ে এ বঙ্গে চলে এলেন এবং এখানেই রয়ে গেলেন। দুজনের ঘাবার উদ্দেশ্য পৃথক ছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন বাঙলা-দেশ যে কোনোদিন ভাগ হবে, একথা কস্মিনকালেও কেউ ভাবে নি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে—তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের লেকচারার, বেতন এত কম যে তাতে তাঁর বড়ো সংসার চলে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিক্ষকদের বেতন বেশি—অনেক অধ্যাপক কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে গেলেন। শহীদুল্লাহ সাহেবও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আগ্রহে ঢাকায় চলে গেলেন। সেই যে গেলেন, ওখানেই থেকে গেলেন। আর ওদুদ সাহেব তাঁর কয়েকটি সারস্বত কর্ম সমাধা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে থেকে গেলেন। ওপার-বাঙলায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির মতো গ্রন্থাগার পাবেন না, প্রয়োজনীয় বই পাবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি এধারে থেকে গেলেন, এবং আরব্ধ কর্মগুলি মৃত্যুর আগে সমাধা করে গেলেন। ওদুদ সাহেব সারা জীবন রামমোহন, কামাল আতাতুর্ক, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যেটের ভাবধারাতেই মানবতন্ত্রের পূজা করেছেন। সর্বদাই এবং সর্বক্ষেত্রে সংস্কারকে পরিহার করে জীবনকে এক মুক্ত আলোর মতো দেখতে চেয়েছেন—

> ধর্মকে যাঁরা আগাগোড়া মোহ বলেন তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করি না, কেননা জীবনের সার্থকতা ধর্মবোধে, অর্থাৎ সত্যে অথবা কোন আদর্শে সমর্পিত-চিত্ততায়।...প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ধর্ম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল কর্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়? (ব্যর্থতার প্রতিকার "শাশ্বত বঙ্গ", পৃ ১৯২, ১৩৫৮)

> ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নয়—জ্ঞান ও জাতীয়তা দেশের লোকদের শরণ্য হবে। (হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ)

শুধু গ্রন্থরচনা নয়, নিজের সাধ্যানুসারে "তরুণপত্র", "সঙ্কল্প" প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করে নিজের উদার মানবিক দৃষ্টিকে তিনি সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ওদুদ সাহেবের এই মুক্ত দৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে তাঁকে বিশ্বভারতীতে নিজাম বক্তৃতা দেবার জন্য সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে-মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশীর্বাদ মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি।'

রবীন্দ্রনাথ যাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলেছিলেন তিনি আজ বিস্মৃত। তাঁর কোনো বই এ-বাঙলায় ছাপা নেই—বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি তাঁর "শাশ্বত বঙ্গ" পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (১৯৮৩)। তাঁর আগে ১৩৭৬ সালে চট্টগ্রাম বইঘর থেকে "নদীবক্ষে" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল। লেখকের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বইপ্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়—এরকম ঘটনা নতুন নয়, এটিই স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। ১৯৭০ সালের মে মাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে তাঁর স্মরণসভায় তাঁর গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশের একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। ওই প্রস্তাব প্রস্তাবই রয়ে গেছে, কাজের কাজ কিছু হয় নি। এ-জাতীয় প্রস্তাব সভা-সভা মৃতজনের স্মরণসভায় নেওয়া হয়ে থাকে—

কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ—সম্পাদনায় রশীদ আল ফারুকী। চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৩৯৪। ৪৫.০০

ফয়জন্নেছা চৌধুরানী—মনিরুজ্জামান। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। ১৫.০০

চিরঞ্জীব নজরুল—মাহমুদ নূরুল হুদা। ঢাকা, স্বর্ণা, নভেম্বর ১৯৮৭। ৪০.০০

আন্তরিকতা থাকে না। তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিমবাঙলার কয়েকটি পত্রিকায় কিছু-কিছু প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সেই প্রবন্ধের একটি বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থে রয়েছে দেখতে পেলাম। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা ছাড়া তাঁকে নিয়ে একটি দীর্ঘ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন একমাত্র আবুল ফজল সাহেবই। এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে ঢাকার "সমকাল" পত্রিকার প্রথম বর্ষ একাদশ-দ্বাদশ (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৫) সংখ্যা এবং দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৬৫) প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধটি তাঁর "সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩৬৯)। ওদুদ সাহেবের মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেন্দ্র মিলায়তনে বাংলা একাডেমী আয়োজিত স্মৃতিসভায় আবদুল কাদির তাঁর সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন (১৯ মে, ১৯৭২)। প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৯ সংখ্যায় বেরোয় (পৃ ১-৬২)। পরে এটি বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯ মে ১৯৭৬), যার ভূমিকা লিখে-ছিলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার ওই সংখ্যায় বশীর আল হেলালের "কাজী আবদুল ওদুদের মর্ম-পরিচয়" নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (পৃ ৯৩-১০৫)। বাংলা একাডেমীর জীবনী-গ্রন্থমালায় ১৯৮৭ ফেব্রুয়ারি মাসে খোন্দকার সিরাজুল হকের লেখা ওদুদ সাহেবের জীবনী বেরোয়। এই একই বছর কয়েক মাসের ব্যবধানে রশীদ আল ফারুকীর সম্পাদনায় "কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ" বইটি বেরিয়েছে।

আল ফারুকী-সম্পাদিত বইটি হাতে নিয়ে বেদনা অনুভব করেছি। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর পোশাকি নাম ছিল খয়ের উল বশর। তাঁর অবর্তমানে বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সদাহাস্যময় মূর্তিটি চোখের সামনে ভাসছে। চট্টগ্রামে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে বসে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডার কথা মনকে ভারাক্রান্ত করছে। তাঁর সম্পাদিত বইটি ওদুদ সাহেবের ওপর নয় জন লেখকের সংকলন এবং গ্রন্থের পরিশিষ্টে "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ" নিজাম বক্তৃতা অংশ সংযোজিত হয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মুসলিম সাহিত্যসমাজ ও বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের কথা বলতেই হয়, কারণ তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন। সেজন্য গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ", লেখক আনোয়ার পাশা। ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পৌরোহিত্যে মুসলিম সাহিত্যসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমাজের বার্ষিক মুখপত্র ছিল "শিখা"—যার মাথার ওপর সাহিত্যসমাজের মটো হিসেবে মুদ্রিত থাকত 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। সাহিত্যসমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকবর্গ। নেতৃত্ব দিয়েছেন আবুল হোসান, কাজী আবদুল ওদুদ, আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। ইয়ংবেঙ্গলের যুগে নব্য হিন্দুসমাজ ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সংস্কারের বিরুদ্ধে লাগামহীন মন্তব্য করতেন, যার ফলে হিন্দুসমাজে প্রতিবাদের ঝড় উঠত; তেমনি সাহিত্যসমাজও মাঝে-মাঝে এমন দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছে যাতে মুসলমান সমাজে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। ইয়ংবেঙ্গলের সঙ্গে সাহিত্যসমাজের তুলনা করে অকালপ্রয়াত প্রাবন্ধিক আনোয়ার পাশা (১৯২৮—১৯৭১) বলেছেন, 'ইয়ংবেঙ্গলদের অন্য অনেক দোষের কথা শোনা গেলেও তাঁদের সত্যবাদিতার খ্যাতি ছিল। কিন্তু অখ্যাতি ছিল ধর্মহীনতার।..... ধর্মহীনতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল মুসলিম সাহিত্যসমাজের বিপক্ষেও। এবং সাহিত্যসমাজের তথাকথিত ধর্মহীনতা বস্তুত তাঁদের অকুণ্ঠ সত্যপ্রীতিরই প্রকাশমাত্র। তাঁরা মানবমুখী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে মুক্তবুদ্ধিকে জাগ্রত করে সবল কাণ্ডজ্ঞানের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন।' (পৃ ৭) আনোয়ার পাশা এই ছোট্ট প্রবন্ধের (পৃ ১-৮) মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল-কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলেছেন আর সম্পাদক ওই প্রবন্ধটি সংযুক্ত করে সুস্বদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আবদুল হকের "কাজী আবদুল ওদুদ" (পৃ ৯-২৫), নারায়ণ চৌধুরীর 'ওদুদ-মানস' (পৃ ২৬-৩৪), আনিসুজ্জামানের "কাজী আবদুল ওদুদ' (পৃ ৩৫-৪১), আবুল ফজলের "মুক্তবুদ্ধির দিশারী : কাজী আবদুল ওদুদ" (পৃ ৪২-৪৭), খোন্দকার সিরাজুল হকের "বাংলার জাগরণ প্রসঙ্গে ওদুদ" (পৃ ৪৮-৫৫) মূলত ওদুদ-রচিত সাহিত্যসংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ওদুদ সাহেবের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মের শাশ্বত নীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য, মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধনে তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত। আবদুল কাদির রচিত "কাজী আবদুল ওদুদ" গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়টি বর্তমান সংকলনে

‘কাজী আবদুল ওদুদের রবীন্দ্রচর্চা’ নামে সংকলিত (পৃ ৫৬-৬১)। এই সংকলনগ্রন্থের সবচেয়ে পরিশ্রমী লেখা হচ্ছে নূরুল আমিনের “কাজী আবদুল ওদুদ : প্রাসঙ্গিক তথ্য।” (পৃ ৭৬-৮৪)। এই প্রবন্ধে ওদুদ সাহেবের জীবন এবং সাহিত্যের পরিচয় সাল-তারিখ দিয়ে বলা হয়েছে—পাঠক তাতে উপকৃত হবেন। এরকম গ্রন্থে এরকম একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধের প্রয়োজন ছিল। তবে ওদুদ সাহেব কিছু পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি—সেই তথ্য এখানে নেই।

ওদুদ সাহেব যে একদা কিছু গল্প-উপন্যাস-নাটক রচনা করেছিলেন—এ সত্য অনেকেরই অবিদিত। সম্পাদক সেই অনতিজ্ঞাত তথ্যের পরিচয় দিয়েছেন ‘কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্য’ (পৃ ৬২-৭৫) প্রবন্ধে। তাঁর উপন্যাস দুটি “নদীবক্ষে” (১৯১৯), “আজাদ” (১৯৪৮), আর গল্পগুচ্ছও দুটি “মীর পরিবার” (১৯১৮) “তরণ” (১৩৫৫)। ওদুদ সাহেব “মানববন্ধু” নামে একটি নাটিকা, “পথ ও বিপথ” নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর নাটকের ওপর কোনো আলোচনা নেই। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধগুলি কোন্ পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে, তার উল্লেখ গ্রন্থ-মধ্যে কোথাও নেই। তৃতীয়ত, প্রবন্ধ-লেখকদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা দরকার ছিল। চতুর্থত, অন্নদাশঙ্কর রায়, মুজফ্ফর আহমদ (সাপ্তাহিক ‘দেশ’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ) প্রমুখের রচনা থাকলে ভালো হত। এসব কথা আর কাকে বলব—সম্পাদক আমাদের মধ্যে নেই—ভবিষ্যতে কেউ যদি উদ্যোগী হয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন তাঁদের জন্য কথাগুলো তোলা রইল।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলমান সমাজে এক অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় তারা বিমুখ ছিল। যেখানে মুসলমান পুরুষ পিছিয়ে ছিল, সেখানে মহিলাদের অবস্থা কী যে করুণ ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক বাঙলায় মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন ফয়জন্নেছা চৌধুরানী। মুসলিম মহিলা সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি শুধু পথিকৃৎ নন—সামগ্রিকভাবে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী। তিনি প্রথম মহিলা মুসলিম সাহিত্যিক যিনি মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা নিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর “রূপজালাল” নামে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে—এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। দানে-ধ্যানে শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি তাঁর সমকালে অনন্য ছিলেন। আরবি ফারসি ছাড়া সংস্কৃতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি “রূপজালাল”-এর উৎসর্গপত্র সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না, তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন। পরদা-প্রথার বিধিনিষেধ সে সময় কঠোর ছিল। তবু তাঁর পিতামাতা তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষক দিয়ে উপযুক্ত-ভাবে গড়ে তুলেছিলেন। আরবি-ফারসি-উরদু অভিজাত পরিবারের মৌখিক ও অনুশীলিত ভাষা ছিল, এবং তার মাধ্যমেই শিক্ষাদান অভিজাত বলে গণ্য হত। কিন্তু তাঁর পরিবার প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন—বাঙলা সংস্কৃত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাল্যকাল তাঁর বেশ সুখেশান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পিতার মৃত্যুর পরই দুঃখযাতনা শুরু হয়। অর্থকষ্ট নয়—বিরাট জমিদার পরিবারে ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম গাঁয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের জমিদারি ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল—তাঁরা ছিলেন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের অমাত্য আগন খাঁর বংশধর। বিত্ত নয়—চিত্ত নানা আঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। সতীনের ওপর তাঁর বিবাহ হয়, ফলে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় নি—বাপের বাড়িতে ফিরে এসে সমাজসেবার কাজ শুরু করলেন এবং জমিদারি পরি-চালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। অত্যাচারী জমিদার-রূপে নয়, প্রজাপালক জমিদাররূপে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৪৫ বছর ধরে জমিদারি চালনা করেছিলেন। ১৯০৩ সালের ৩রা সেপটেমবর তাঁর মৃত্যু হয়। এই মহীয়সী মহিলা সারাজীবন নানা জনহিতকর কাজ করেছেন, নানা প্রতিষ্ঠানে দানধ্যান করেছেন। গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন, মহিলাদের জন্য পৃথক চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিটি মৌজায় দীঘি-পুকুর খননের ব্যবস্থা করেছেন। মক্কা শরীফে হজ করতে গিয়ে জলের সঙ্কট দেখে মজে-যাওয়া খাল পুনঃখননের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। মক্কায় দুটি ও মদিনায় একটি মাদ্রাসায় যথাক্রমে তিনশ ও একশ টাকা তিনি নিয়মিত সাহায্য করতেন। মানুষ চলাচলের জন্য একাধিক রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণ করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য জমিদারির বিভিন্ন মৌজায় তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মসজিদের সংলগ্ন মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন, গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ যখন মুসলমান ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করছেন তখন ফয়জন্নেছা অজ পাড়াগাঁয়ে বসে তাঁদের আগে ইংরাজি শিক্ষাদানের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সব জাতিরই প্রবেশের অধিকার ছিল। তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাকিলা-বিদ্যালয়ে কোনো মুসলমান নারী লেখাপড়া করে নি। প্রজাদের উন্নতিকল্পে নানা লোকহিতকর প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তিনি ‘নবাব’ খেতাব পেয়েছিলেন। নিজে কবিতা গান লিখলেও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বরাবর। “বান্ধব”, “সুধাকর”, “ইসলাম প্রচারক”, “ঢাকা প্রকাশ” প্রভৃতি পত্রিকাকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত “সখী সমিতি”র সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল—তিনি ওই সমিতিতে দু শ টাকা দান করেছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহিলার জীবনকথা এই প্রথম একটি গ্রন্থে গ্রথিত করলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান এবং জীবনী নির্বাচনে ফয়জন্নেছাকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা একাডেমী এক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। ফয়জন্নেছা সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন মুহম্মদ আবদুল হাই—তাঁর “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” (আধুনিক যুগ ১৯৫৬) গ্রন্থে। তারপর ড. আনিসুজ্জামান (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৯৬৪) ড. মজীরউদ্দীন (বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা ১৯৬৭) এবং আরও অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। ড. মনিরুজ্জামান সব কটি তথ্যকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়ন করেছেন—যার মধ্যে ওই প্রথম ফয়জন্নেছার সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাঁরা বুঝতে পারবেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে এরকম একজন জনহিতকামী মহিলার আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁর সঙ্গে রানী রাসমণির তুলনা চলতে পারে ; যিনি গণ্ডগ্রামে থেকে উনিশ শতকের নবজাগরণের বাণীকে নিজ অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। এই মহিলার জন্মসন নিয়ে এবং কৃতকর্মের যথার্থ ঐতিহাসিক

বিবরণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে—মনিরুজ্জামান সাহেব বেশ ধীরগতিতে একটির পর একটি গ্রন্থিমোচন করে ফয়জন্নেছা চৌধুরানীকে আমাদের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। লেখকের এই কৃতিত্ব বিশেষ-ভাবে স্মরণীয় দুটি কারণে—প্রথমত তাঁর সরলীকৃত বিন্যাস-পদ্ধতির সঙ্গে মনোগ্রাহী আন্তরিক বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থের সারা অঙ্গে বিদগ্ধজনোচিত আবহরচনা।

“চিরঞ্জীব নজরুল” বইটি নজরুলের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থ নয়। নজরুল ও নজরুল পরিবারের সঙ্গে লেখক মাহমুদ নুরুল হুদার দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল। ১৯৪২ সালে নজরুল যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন কবিকে অর্থসাহায্যের নামে কিভাবে সরকারি ও বেসরকারি মহলে টালবাহানা চলছিল, সাহায্যের নামে কবিপরিবারকে কিভাবে মাঝে-মাঝে বঞ্চনা করা হয়েছে, কবিকে সুস্থ করার বিষয়ে কিংবা খাওয়াপরার বিষয়ে কবিপত্নী ও কবিপুত্রদের কিরূপে উদ্বেগকাতর দিন কাটাতে হয়েছে, তার একটি চিত্র আলোচ্য গ্রন্থে হুদা সাহেব আমাদের দিয়েছেন। এখানে লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখেছেন এবং তাঁকে লিখিত কবিপত্নী ও কবিপুত্রদের চিঠিগুলি হুবহু ছেপে দিয়েছেন। এর ফলে বিষয়টি প্রামাণিক হয়ে উঠেছে। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭৬ অর্থাৎ কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত কবি ও কবিপরিবারের অর্থসাহায্য বাবদ যাবতীয় তথ্যাদি এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে এবং লেখক যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইটি রচনা করেছেন তা সফল হবে এই কারণে, নজরুলের ভবিষ্যৎ গবেষকগণ কবিজীবনী লিখতে গিয়ে নজরুলের অন্তিমজীবনের দুঃখকষ্টের অনুপুঙ্খ বিবরণী পাবেন, কাগজপত্র ঘাঁটার দরকার হবে না। লেখক সবকিছু হাতের সামনে তুলে দিয়েছেন—গবেষকদের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বদরুদ্দীন ওমর বইটির একটি ভূমিকা লিখেছেন। কবি ও কবিপরিবারের আলোকচিত্র ও যাবতীয় চিঠির ফটোস্টাট কপি থাকায় বইটির গুরুত্বও বেড়েছে।

অসমীয়া কবিতার সংকলন

সৌমেন সেন

কবিতাসংকলন নানারকম হতে পারে। কখনো দশক-শতকের, কখনো যুগভিত্তিক, কখনো বা আদি থেকে সাম্প্রতিক। এ ছাড়া তো বিষয়-নির্ভর আছেই—প্রেম, প্রতিরোধ ইত্যাদি। সংকলন কেমন হবে, নির্বাচনই বা কোন্ মাপে, তা অনেকটাই নির্ভর করে সংকলকের উদ্দেশ্য আর মরজির ওপর। অবশ্য আজকাল ব্যবসায়িক তাগিদও যে থাকে না, তা নয়। বস্তুত, ওই তাগিদটাই বোধহয় ইদানীং বেশি কার্যকর, নইলে বাঙলা কবিতার অন্তত হরেক-রকম সংকলন প্রকাশিত হত না।

অসমীয়া কবিতার সংকলন "সোণৰ সঁফুৰা", ভাবতে অবাক লাগে এখনো, এই যুগেও, নিতান্তই একজন কবিতা-প্রেমীর আবেগ-আগ্রহের ফসল। একজন প্রযুক্তিবিদ, সারা জীবন নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল পদে ব্যস্ত থেকেছেন এবং অবসর-অন্তে কবিতার প্রতি ভালোবাসাতেই এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। এই ভালোবাসা আর আবেগ যে নিতান্তই ব্যক্তিগত পছন্দের, তাও কিন্তু নয়; বোঝা যায়, একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল। হয়তো সময়ের অভাবে প্রকাশ-কাল সম্পাদকের অবসর-অন্ত।

অসমীয়া কবিতার সংকলন খুব বেশি নেই। অন্তত ব্যবসায়িক তাগিদ এখনো তেমনভাবে সংকলন-উদ্যোগ চালনা করে না। ফলে যে কটি সংকলন প্রকাশিত, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সংকলকের নিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিনিধি-মূলক এবং সার্থক। দুটি উদাহরণ: একটি মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত ও সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত "সঞ্চয়ন" ও দ্বিতীয়টি নীলমণি ফুকন সম্পাদিত "কুড়ি শতিকাৰ অসমীয়া কবিতা"। প্রথমটি যেমন অ্যাকাডেমিক ও ঐতিহাসিক, অন্যটি একজন কবির নির্বাচন। অসমীয়া সাহিত্যের পাঠকের কাছে, অন্তত যিনি অসমীয়া ভাষায় রচিত কবিতার ধারা-বাহিক ইতিহাস জানতে চান তাঁর কাছে, মহেশ্বর নেওগ মহাশয়ের "সঞ্চয়ন" যে অবশ্যপাঠ্য, তা এই সংকলনের বহুল প্রচারেই প্রমাণিত। সম্পাদকের সুলিখিত ভূমিকা, 'অসমীয়া কবিতার কাহিনী' ও প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রধান কবিদের কবিতার সঞ্চয়ন সংকলনটিকে বস্তুতই বিশিষ্ট করেছে। মহেশ্বর নেওগের সংকলন যথার্থই অ্যাকাডেমিক এই অর্থে যে, যে-কোনো সাহিত্যপাঠকের কাছেই অসমীয়া কবিতার মর্মোদ্ঘাটনে এই সংকলন অবশ্য পাঠ্য। নীলমণি ফুকন আধুনিক কবিতার সংকলন করেছেন কবির বিচারে, তাই তাঁর নির্বাচনে কাব্য-পক্ষপাত থাকবেই। তা ছাড়া, তাঁর সংকলনের যুগসীমাও তো বিশশতক মাত্র। ইতিহাস এক্ষেত্রে প্রধান নয়, যদিও একশতকের ইতিহাসও তাঁর সংকলনে বিধৃত।

"সোণৰ সঁফুৰা"র সংকলক ভবকান্ত শইকীয়া ভিন্ন কোটির কবিতাপ্রেমিক। হয়তো বা 'দেশজ সংস্কৃতিপ্রেমিক' এই অভিধাটি তাঁর ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। লিখিত ও মুদ্রিত কবিতার পাশাপাশি লোককবিতার সংকলন এই প্রেমেরই নজির। শুধু ইতিহাসই যে তাঁর লক্ষ্য নয়, তার প্রমাণ অতি সম্প্রতি বইটি প্রকাশিত হলেও, আধুনিক কবিতার নির্বাচন চল্লিশের দশক পর্যন্ত। তার পরের কবিতা এই সংকলনে অনুপস্থিত।

সংকলক ভবকান্ত শইকীয়া জানাচ্ছেন প্যালগ্রেভের "গোলডেন ট্রেশারি" তাঁর আদর্শ। সংকলনের নাম "সোনৰ সঁফুৰা"ও তাই প্রমাণ করে। সে অর্থে ইতিহাস হয়তো তাঁর একটি লক্ষ্য—কিন্তু প্রধান নয়। আর আধুনিক কবিতার সাম্প্রতিক অংশে তাঁর মনোযোগ কেন নেই, তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। হয়তো বা সময় আর বীক্ষার অভাব। কিন্তু যে কারণে সংকলনটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল লোককবিতার প্রতি মনোযোগ। মহেশ্বর নেওগের "সঞ্চয়নে" এই অংশটি নেই। এবং শংকরদেব মাধবদেব প্রভৃতির কবিতার সংখ্যাও "সোনৰ সঁফুৰা"তে বেশি। অর্থাৎ অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির যে প্রধান দুটি ধারা দেশজ চেতনার সাক্ষ্য—শংকর-মাধবের কাব্য-আদর্শ ও লোককবিতার প্রবাহ—তা এই সংকলনে উল্লেখযোগ্য মনোযোগ পেয়েছে। শংকরদেবের চোদ্দটি কবিতা আর দশটি গীত, মাধবদেবের ছটি কবিতা আর দশটি গীত যে আবহ তৈরি করে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন সংকলিত হয় ডাকৰ বচন, লোকগীত, বিহুগীত, বিহুনাম ও বিয়ানাম। এই সংকলনের বিশিষ্টতা এখানেই।

সংকলক ভবকান্ত শইকীয়াকে তাই অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। এই সংকলন প্রকাশের জন্য অসমীয়া কবিতার পাঠক ও অসমীয়া সংস্কৃতির অনুরাগীরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

সোণৰ সঁফুৰা—ভবকান্ত শইকীয়া। শ্রীমতী কমল কুমারী বরুরা চেরিটেবল ফাউণ্ডেচন্, মহাত্মা গান্ধী ৰ'ড, যোরহাট। ১৯৮৬। ৪০ টকা।

কবিতার কথা

পরিমল চক্রবর্তী

১

'বারো সূর্যের মহড়ায়' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, এটি বর্ষীয়ান কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে কবি হিসেবে তাঁর যে-চারিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এক কথায় বলতে গেলে তাকে বলতে হয় বৈদগ্ধ্য। কেননা শাণিত বাক্‌চাতুর্য, তীক্ষ্ণ আঙ্গিকচেতনা, তীব্র ব্যঙ্গ-প্রবণতা—ইত্যাদি যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি একজন বিদগ্ধ কবির রচনায় আমাদের প্রত্যাশিত, সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রায় সব কটিই এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কম-বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। সপ্রতিভ বাক্‌চাতুর্য বা smartness of diction-এর যে-ধারা আমাদের সাহিত্যের তিরিশের দশকের কয়েকজন প্রধান কবি (বিশেষভাবে বিষ্ণু দে ও সমর সেন) সৃষ্টি করে গিয়েছেন, কবিতার রচয়িতা হিসেবে বিরাম মুখোপাধ্যায় প্রধানত সে-ধারারই একজন সচেতন অনুসারী; এবং এই ধারার অনুসৃতি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রবল। যেমন:

বাস্তবের চিন্তার ব্যায়ামে পরিক্লান্ত তবু খুঁজি
সুষুম্নার মৌল কেন্দ্রে ব্যতিক্রমী সূচনা-শিকড়
('পরা বাস্তবের মতো')

কিংবা

জীবনকে খুঁজে নিক ঝামাঘষা দিনানুদৈনিকে
জ্যা-মুক্ত ছিলার তীব্র গুণটান টংকারে-টংকারে
('অগ্নিবীণা: অস্ত্রিতে তন্ত্রীতে)

কিন্তু বাক্‌চাতুর্যের প্রতি এই আত্যন্তিক আকর্ষণ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে এমন এক দুর্মর মোহের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে তাঁর কোনো-কোনো রচনা নিছক বাক্‌চাতুর্যের কসরতে পরিণত হয়েছে, ভাবসমৃদ্ধ কবিতায় পরিণতি পায় নি। এই প্রসঙ্গে 'দান অনুদানে নয়', 'ছেঁড়া-কাঁথার স্বপ্নে', 'অখণ্ড-মণ্ডলাকে', 'কলাবতী রাগে ২' কিংবা 'হৃদয় ভাঙলে' ইত্যাদি রচনার কথা বলা যেতে পারে।

বাক্‌চাতুর্যের আত্যন্তিকতার মতোই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাড়াবাড়িও এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট। 'জরিপ' কবিতার:

ইশ্‌কাপনের ছুরি তিরি
নয়, জলজ্যান্ত জোড়ায়-জোড়ায়
সাহেব বিবির ফ্যানাওঠা ফূর্তি ছ্যাখো।

অথবা 'কাঠটগরের শাদা' কবিতার:

কিছু উঁচ্‌কপালে ও র‍্যাদাঘষা উটকো ধনীর
শখশিল্প ঝুল-বারান্দার টেরাকোটা টবে-টবে
টকটকে ব্ল্যাকপ্রিন্স দেদার ফুটছে,—

কিংবা 'বৈশাখবলয়ে' কবিতার;

নৃত্যনাট্যে নীবি নাভি চাটাপোছা উরুর মুদ্রায়
জুত্‌সই রতিরঙ্গ-গবেষণা—মহার্ঘ ঢৌকনে
ফাঁদ পেতে বাজীমাত, পুঁজিপতি ক্রীতদাস বাঁধে।

এবং এই গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'সিদ্ধির স্বরূপ'র প্রায় সমস্তটাই এই সিদ্ধান্তের সমর্থক দৃষ্টান্তরূপে স্মরণীয়।

তাঁর রতিমার্গী কবিতায় (প্রেমের কবিতা বলছি না এই কারণে যে সত্যিকারের প্রেমের কবিতা চৌষট্টি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে একটিও নেই।) নারীপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা শুধু সকাম কিংবা শরীরীই নয়, তা একই সঙ্গে সতেজ ও সাহসীও বটে। অনুমান করি, যথার্থ জীবনসম্ভোগী কবি বলেই যৌনতার রগরগে দিকটা আয়ুর উপান্ত্যকালীন এই বয়সেও তাঁকে রীতিমতো আকর্ষণ করে, কেননা তাঁর কবিতায় এ-বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। মাত্র 'সিদ্ধির স্বরূপে' কবিতাটিরই এ-ধরনের ছটি অংশ:

॥ ১ ॥

বেহাত হবার আগে জিতে নিন জিদের নিলাম
অনির্বিন্ন নবনী দেহের
নিলাম! নিলাম!
… … … …

বারো সূর্যের মহড়ায়—বিরাম মুখোপাধ্যায়। নবার্ক, ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, কলকাতা-৫৯। ষোলো টাকা।

আউশছড়ার মরা মুখ—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

ধ্বস্তাশ্ব-ভাববতী—মঞ্জুভাষ মিত্র। নবার্ক, ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, কলকাতা-৫৯। ষোলো টাকা।

লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা—জিয়া হায়দার। বর্ষ-মিহির প্রকাশনী, ইছামতী, ১১ রিং রোড, ঢাকা-১২০৭। বিশ টাকা।

॥ ২ ॥

কোরা-থানে
সকরুণ ক্ষুধিত বিধাতা
… … … …

॥ ৩ ॥

সতীচ্ছদ ছেঁড়া কোনো হঠাৎ-জননী
যৌনতার অশৃঙ্খলা অশ্রাব্য কলহ
অর্থবহ বাতাসের কানে
কেউ কিছু ছুঁড়ছে রটনা :
… … … …

॥ ৪ ॥

চোরনীর চোরাগোপ্তা খুচরো কামকেলি
চুসকি অবয়বে, অমেয় আসব মেদপিণ্ডে
… … … …

॥ ৫ ॥

টপ্‌নট ফ্রেঞ্চরোল খোপার বাহার
বাঁকাবে অ্যালানে এই পোক্ত নিপুণিকা,
আনগ্ন জানুতে আর আপত্তি কিসের!
… … … …

॥ ৬ ॥

দর্শক-দর্শিকা-ঠাসা দমবন্ধ গ্যালারিকা শাদা
উরুর উর্মিল কারু-কসরতে আহ্লাদে গড়ায়।

এবং আরও অনেক কটি কবিতায় এ-রকম আরও অনেক কটি উদাহরণ ছড়ানো রয়েছে।

বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শব্দনির্বাচনে ও প্রয়োগে আকস্মিক গুরুচণ্ডালী কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রসাভাস ঘটালেও আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে, অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাচিত্তে চমকসৃজনে প্রয়াসে প্রায়শ সার্থক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের (এবং সেই সঙ্গে কবিকেও) ভেবে দেখতে হবে 'ব্যতীপাত', 'নিথর', 'হাড্ডাহাড্ডি', 'অনৃজু', 'কিঞ্চল', 'বিপর্যাস', 'অকৈতব', 'মাটামসই', 'উতোরপাড়া'; (উত্তরপাড়ার অপভ্রংশ?), 'নিবিঘ্ন', 'শমশান্তা', 'বৌড়ী'—ইত্যাদি শব্দের কোনো কাব্যমূল্য আদৌ আছে কিনা, কিংবা থাকলেও ততখানি আছে কিনা, যতখানি থাকলে কোনো শব্দকে নির্বিচারে কবিতায় স্থান দেয়া চলে?

২.

পঞ্চাশের দশকের অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ কবি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম কাব্যগ্রন্থ 'আউশছড়ার মরামুখ'। অপূর্ব সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ প্রচ্ছদের মতোই এই গ্রন্থে কলিত কবিতাগুলিও অপূর্ব লাবণ্যে ললিত। এবং এই লাবণ্য যত না রূপরীতিগত, ততোধিক ভাব বিষয়ক। কিন্তু এই ভাব-লাবণ্যের সঙ্গে অন্য যে-উপাদানটি পরিমিতরূপে সংমিশ্রিত হলে কবিতা শিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠে, সেই চিন্তার গাঢ়তা কিংবা মননের গভীরতাকে এই কবিতাগুলির কোনোটিতেই তেমন খুঁজে পাওয়া গেল না। অর্থাৎ, দর্শন যে সর্বদা কবিতার শত্রু নয়, বরং সর্বথা মিত্র এবং অবস্থাবিশেষে পরম মিত্র, কাব্যসাহিত্যের এই স্বীকৃত সত্যটি, মনে হয়, আলোচ্য কবির কবিতাভাবনায় হয় সম্পূর্ণ অস্বীকৃত, নয় আংশিকভাবে স্বীকৃত। তা না হলে যে-কবি লাবণ্যের প্রসাধনে তাঁর কবিতার দেহকে এতখানি শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে পারেন, সে-কবি তাঁর কবিতার আত্মাকে দর্শনের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারবেন না কেন? অথচ তাঁর কবিতায় দর্শনের উদ্ভাসন সম্পূর্ণ দুর্নিরীক্ষ্য না হলেও নিতান্তই নগণ্য।

দেবীপ্রসাদ মূলত জীবনানন্দীয় কাব্যপরিমণ্ডলেরই অধিবাসী। কিন্তু জীবনানন্দের ঔদাস্যবিমিশ্র ইহরাগ তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। বরং তার স্থলে যা তাঁর কবিতায় সর্বদাই এবং তাঁর কবিতার সর্বত্রই উপস্থিত, তাকে বলা যেতে পারে অভিমানভারাতুর প্রকৃতিপ্রেম। এই অভিমানাতুর প্রকৃতিপ্রেমে আবিষ্ট হয়েই তিনি ছন্নছাড়া পথিকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন আলুলায়িত গ্রামবাঙলার দূরবিসারী পথে-প্রান্তরে—লক্ষ করেছেন 'মরা রামধনু ছিঁড়ে পড়ে আছে, ভাঙা ঘাটলায় / থুবড়ে শুয়ে আছে গাব-লেপা দিশি নৌকো' (সূর্যাস্তের পর), 'শুদ্ধ দুপুরের গায়ে গ্রাম্য স্টেশনের মাল-গাড়ি / বোঝা করে নিয়ে চলে গোটা গ্রামখানা' ('জলরঙ'), 'জলে চক্র ওঠে একটু স্মৃতির ঘাই লেগে…' ('সব অনুভূতি ওরা জমিয়ে রেখেছে'), 'চতুর্ধারে সাজানো বাগান দৃপ্ত ডালিয়ায় আলোকিত হয়ে আছে।' ('ওরা'), 'কাটা ফসলের ডগা মাড়িয়ে হাঁটছে শেষ বেলা।' ('কার্তিকের মুখ'); দেখতে পেয়েছেন 'ডেকখানা কালো হয়ে ঘুম দিচ্ছে উনুন নিবিয়ে।' …'বেলাটুকু ঝরাতে ঝরাতে উড়ে গেল টিয়ে ঝাঁক।' ('খেয়া'), 'তিরতির হাসির জলে ডুবে যায়, সদাপ চিবুক'…'জল—শুধু জল—ঘোর-পাতা জল—মাথা-

জল—' ('জল'), সন্ত্যজায়মান ছন্দ ডালপালার লক্ষ হাতে হাতে / বিষকুঁড়ি দিয়ে ওঠে'…'দ্রুত হাতে কুলকুচি করে' ('সাপ'), 'মাঘবীথিকার চক্রবালে / কপিশ কুয়াশা'… 'মাথার উপর দিয়ে ঝিঁঝির ঢেউয়ের পর ঢেউ—' …'শাদা ফ্যাকফেকে চাঁদ' ('ঝিঁঝিঁ'); শুনতে পেরেছেন 'মাটি আর জল কথা-বলাবলি করছে।' ('খেয়া'), 'সারাটা রাত ফুঁসে বেড়ায় ফলের বিষ। সারাটা রাত ছুটে বেড়ায় ঝোড়ো হাওয়ায় ঘোলাটে চাঁদ—' ('সারাটা রাত ছুটে বেড়ায়')।

জীবনানন্দের কোনো-কোনো কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দ-গ্রস্ত দেবীপ্রসাদের কোনো-কোনো কবিতাকে পাশাপাশি রেখে নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করলেই অনুভূত হয় যে জীবনানন্দের ঔদাস্যই দেবীপ্রসাদে পৌঁছে অভিমানে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং এই অভিমানবোধ তাঁর মধ্যে যে কত তীব্র আর তীক্ষ্ণ, এই কাব্যগ্রন্থের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কবিতার বিচ্ছিন্ন এই পংক্তি কটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—'দেবতা, আমার যাচনা নেই, মনস্কাম নেই' ('বালিঘাত : সুবর্ণরেখায়'), 'মদ স্পর্শ করব না, চোখ ভরে দেখব মৃত্যুকে' ('মত্তশবর চর্যা'), 'আর আমায় অমন দু'হাত ভরে জড়িয়ে ধরো না…('আত্মঘাত'), 'না গো না, যাব না'—, ('রক্তকাশ'), 'আবার একদিন ফিরে যাব শেষরাতে, সবার চোখ এড়িয়ে খুব সঙ্গোপনে / আবার ফিরব ফিরব ঠিক, মনে রেখো, / খুব সঙ্গোপনে—' ('মনে রেখো')। এবং এই প্রত্যাবর্তনের কারণ স্বরূপেই যেন পরম অভিমানাহত হয়ে 'মুখোশ' কবিতায় তিনি স্বপ্নতাড়িতের মতো স্বগতোক্তি করছেন :

আমায় / সবাই ভুলে গিয়েছে শুধু অর্জুনগাছের পেছনের ওই আকাশ একদণ্ড ভোলেনি।

কবি হিসেবে দেবীপ্রসাদ শুধু শব্দসজাগ বা শব্দসচেতনই নন, তিনি শব্দনির্মাণক্ষমও। তাঁর শব্দনির্বাচন ও ভাষা-ব্যবহাররীতি নিঃসন্দেহেই লৌকিক; কিন্তু তা সর্বাংশে গতানুগতিক নয়। ভাষাঘটিত ব্যবহাররীতিতে স্ব-উদ্ভাবিত নিত্য নূতন শব্দ ও বাক্যবন্ধ সংযোজনের মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনার প্রয়াসী তিনি। এই লেক্সিক্যাল লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কোনো-কোনো শব্দকে তিনি প্রচলিত অর্থে ব্যবহারের পরিবর্তে ভিন্নার্থে ব্যবহার এবং অনেক অচলিত ও পরিত্যক্ত শব্দকে পরিত্যাগ না করে আধুনিকীকরণে প্রয়াসী হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই 'নিরূর্মি', 'শতার্চি', 'পন্থ আঁধা', 'অকামা', 'সময়যাপনী', 'আতাপ-অঢেউ', 'অম্বুদ্বেজে', 'নিস্পর্শ', 'আপাদচুলাগ্র', 'পত্‌ঝর', 'নির্বণ', 'ভ্রমণ-নিস্তাপ', 'আষ-নীরবতা', 'বর্ণিকাভঙ্গ', 'নিহুট', 'গোর-পুরী', 'একাভেকা', 'দিশারা', 'আনভ', 'আলুন', 'নবত', 'আনেবানে', 'তাঁবা-ধরা', 'অফুর', 'তুরিত', 'অর্চা', 'রিষ', শুনী', 'ঠোলা-মালা', 'শতাক্ষ', 'ক্ষুভিত', 'বৃহিত', 'আতাপা', 'আমাঠ', 'রঙ্গোলী', 'উরগ', 'অতিগ', 'নহর', 'মশারি-নিহুট' —ইত্যাদি শব্দের উচ্ছ্রিত প্রয়োগ লক্ষ্যের অগোচরে রাখা কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। তাঁর এই প্রয়াস মতই প্রশংসনীয়-পদবাচ্য হোক না কেন, শব্দ-সম্পর্কিত তাঁর এই মানসিক পশ্চাদঅপসারণে আধুনিক কবিতার আধুনিক পাঠক-পাঠিকারা কতখানি সহর্ষ সম্মতি জানাবেন, এ-সংশয় পোষণ করা কিন্তু আদৌ অবাস্তব অথবা অনুচিত নয়।

৩.

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'ধৃতাশ্ব-ভাববতী'র কবি মঞ্জুভাষ মিত্রও প্রচণ্ড অভিমানী। এই অভিমানের ছাপ তাঁর রচনায় প্রায়শ স্পষ্ট। তবে তাঁর ক্ষেত্রে অভিমানের স্বরূপ আর তার প্রকাশের ধরনটা স্বতন্ত্র। কবি হিসেবে মঞ্জুভাষের অভিমান প্রগাঢ় কামনা-সংরক্ত, অর্থাৎ প্যাশনেট; আর, সেই অভিমানের প্রকাশটাও অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত চাপা। এবং চাপা হবার ফলেই সেই অভিমান যেখানটায় যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে, সেখানটায় ততটুকুই হয়েছে স্পষ্ট আর তীব্র। অর্থাৎ, অভিমান প্রকাশের চাপা ভাবটাই তাঁর অভিমানের প্রকাশকে প্রখর আর প্রবল করে তুলেছে। তাঁর অভিমানের কারণ সম্বন্ধে তিনি আমাদের অন্ধকারে না রেখে খোলাখুলিভাবেই বলেছেন, 'আমার মুখের ঢেউ / খুঁজত যাকে সে নেই আজ' ('সাগরবিলাস') এবং সেই অভিমান নিরসনের পন্থা হিসেবে জানিয়েছেন, 'মন করেছি শোক কমাতে সাগরতীরে চলে যাব'…'বালুর নিচে ঘুমিয়ে থাকবো…ফিরবো না আর ঘুমিয়ে থাকবো' ('পাথর')। আবার এই অভিমানবোধ ক্রমশ তীব্র হতে-হতে কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুচেতনায় নয়, নিছক মৃত্যুকামনায় পর্যবসিত হয়েছে, যেমন 'বিদায়' কবিতায় 'এবার আমাকে বিদায় দাও / সবুজ রুমাল নেড়ে দূরপথে যাত্রী মানুষকে যেভাবে বিদায় / দেয় ঠিক সেইভাবে, / আমাকে তুমি নীরবে চলে যেতে দাও / আমি আর ফিরে আসবো না / তোমাদের এই জলের দেশে 'মৃত্যু' নামক সাঁকোর উপর / তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না…' কিংবা 'ধৃতাশ্বের পথে হৃৎপিণ্ড ক্রমাগত'

'হে দুঃখলতা, ছায়াবাঁধনে আমার হাত পা বাঁধো, / প্রেতের মতো অগ্নিচক্রে আমাকে ছুঁড়ে ফেল, ভাসিয়ে দাও মৃত্যু নামক নদীর জলে।'

মঞ্জুভাষের কবিমনের একটা অংশ মর্বিড এবং বিশেষ-ভাবেই মর্বিড, যে কারণে তাঁর এই গ্রন্থের কোনো-কোনো অংশ মর্বিডিটির স্পষ্ট বিকারে অত্যন্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ফলে, যখন 'বোহেমিয়াতে কিছু কোমলাঙ্গী অস্ত্র' কবিতায় তিনি নিবেদন করেন, 'আত্মদান করে যোদ্ধা যুবকদের কাছে / দৃশ্যবতী যুবতীর দল। ইজের অন্তর্বাস শাড়ি খুলে ঘাসের উপর / ঝরা শিশুর মতো ছড়িয়ে দেয় / এমন কি এক সময় নিজেরাও শুয়ে পড়ে।', 'মধুর, তুমি চলে গিয়েছ' কবিতায় উপলব্ধি করেন 'বিছানাই সৌন্দর্যবোধের কেন্দ্রস্থল', 'রূপনারায়ণ' এবং 'কালী' কবিতায় যথাক্রমে অবলোকন করেন, 'উলঙ্গ দেহ ভ'রে কুবলয় ফুটে ওঠে' এবং 'স্তনে স্তনে উত্তোলিত ভীম খড়্গ কামে আর্দ্র'…'ঋতুর প্রভাবকালে বিশুদ্ধ স্বরের মতো আলিপ্ত যৌনতা', 'অভিজ্ঞতার গান' কবিতায় প্রশ্ন করেন 'নারী-আলিঙ্গিত নরের রূপ কেমন?' কিংবা জ্ঞাপন করেন, 'আমি আমার পুংলিঙ্গটি খুলে / একটি কাঠের বাক্সে রেখেছি'…'সুড়ঙ্গ খোঁড়া হচ্ছে আর প্রতি সুড়ঙ্গের তলদেশে / একটি করে যোনিযন্ত্র পাওয়া যাবে।' অথবা 'জলাশ্বের অধ্যুষিত নদী' কবিতায় অবিকল সমর সেনের ভঙ্গিতে 'পৃথিবী ছাড়ার আগে শেষবার রমণের সাধ'-অভিলাষে আর্তনাদ করে ওঠেন,—তখনই আমাদের মনে এক ধরনের বন্য বিবমিষা উদ্রিক্ত হয়, এক ধরনের তীক্ষ্ণ অস্বস্তিতে পাঠকচিত্ত সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

আলোচ্য গ্রন্থের কিছু সংখ্যক কবিতায় অলৌকিকের ছোঁয়া যেমন লেগেছে—('আজ রাতে…সিংহরাশির তৃষ্ণা ও হাহাকার শোনা যাবে / সিংহরাশির প্রভাবঅধীন দেবীমুখ দেখা যাবে' : 'পুতুল-নাচ'), ('আমার মধ্যস্থ মানুষটিকে প্রণাম করো' : 'সাগরতীরে দখিন বাতাস'), ('এখন সময় ঠিক থেমে আছে কুমারী চাঁদের নাভি-মণ্ডলীর নিচে॥' : 'হিপোপটেমাস'), ('ধূপের ডানায় পাড়ি দিল মূল-মণিপুরে যাবে / নাভির ভিতর দ্বিতীয় নাভির রহঃস্পর্শ পাবে।' : 'সন্ধ্যাবিহারে নগ্ন-নারীর অনুসন্ধান'), ('ভুটান দেশের নারী তুমি / তুমি চিত্রমদ / শ্বেতাশ্বপথে ভাববতী কীর্তনের রূপে / স্ফীত হয়ে উঠেছে তোমার রঙ' : 'আত্মজিজ্ঞাসার শিল্প'), ('হৃদয়বাসী বনদেবতা এইরকম অভিপ্রায় করেছেন। তার বাঁশিতে মৃত্যু ও ভয় এই দু'রকম সুর বাজে॥' 'দ্বাদশ গোলাপ'), ('বনদেবী আজ রূপেশ্বরের পরমা এবং ঈপ্সিত / হয়েছেন বলে বৃক্ষের ত্বকে সঙ্গীতধ্বনি শোনা যায়' : 'দুর্গার দর্পণ'),—কোনো-কোনো কবিতায় কবির আত্মোপলব্ধির আভাও তেমনি জেগেছে—('সৌন্দর্য ও দর্শন পরস্পর জায়গা বদল করে॥' : 'সাগরতীরে দখিন বাতাস'), ('ফিরে যেতে হবে সহজের কাছে।' : 'এই গোলাপের মহাসুগন্ধ'), ('নির্জনতার চেয়ে বড় অভিশাপ নেই' : 'হিপোপটেমাস'), ('দীর্ঘদিন অত্যন্ত ভালো ও পবিত্র জীবনযাপন করে একঘেয়েমির শিকার হয়েছি। এবার খারাপ হয়ে যাবো, ভীষণ খারাপ হয়ে যাবো।' : 'সন্ধ্যাবেলা দরজা'), ('আমার স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন অবয়বের মধ্যে অবয়ব' : 'ভাববতীর উদ্দেশে রচিত পাঁচটি প্রণয়গীতি') এবং ('যেন মৃতের দেশ থেকে / ফিরে এসেছি নতুন করে জীবনের নিয়মসমূহ / অভ্যাস করবো বলে।' : ('নীল সিংহের অন্তর্বর্তী দেবতা') ইত্যাদি।

দু একটি কবিতায় কবির কাব্যভাবনার নিদর্শন বিদ্যমান—যেমন 'আত্ম-জিজ্ঞাসার শিল্প' কবিতায় 'প্রাচীন কবিতা পাঠের বিরল আনন্দ' তিনি প্রকাশ করেন, 'তিনধরিয়ার পথে' কবিতায় মহানদী ও মহাসূর্যের কাছেও কবিতার সন্ধান পেয়ে তাদের উদ্দেশে 'হে মহানদী / হে মহাসূর্য তোমার স্নিগ্ধ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা শেষ হ'ল' ব'লে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং 'মানবপুত্রী হারমোনিয়াম শোনো' কবিতায় 'এক বিশেষ ধরনের সংগীতই হবে কবিতার মূল উৎস'—কবিতার উৎস সম্পর্কে এই স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

'শ্বেতাশ্ব-ভাববতী'র অধিকাংশ কবিতাই কামজারিত প্রেমের, তবু নাম-কবিতাটিতে যখন নিজের প্রেমিকাকে তিনি এই বলে বিশেষিত করেন—'তুমি মদ্যের অপেক্ষা আরো সাতগুণ উজ্জ্বল'—তখন তা কবির প্রেমিকার সর্বাঙ্গকে না হলেও অন্তত তাঁর প্রেমিকার গাত্রবর্ণকে সত্যিই বিশেষ-ভাবে মনে রাখার মতো হয়ে ওঠে বৈকি।

ফরাসি চিত্রশিল্পী সি.এফ.এল. গিরার্দ-অঙ্কিত এই কাব্য-গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রটি যত না ভাবোদ্দীপক তার চেয়ে ঢের বেশি কামোত্তেজক॥

৪.

জিয়া হায়দারের "লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা" গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতাই একটি বিশেষ ভাবের দ্বারা তাড়িত, একটি নির্দিষ্ট চিন্তার দ্বারা জারিত। সেই ভাব

আর চিন্তা সাধারণ অর্থে স্বদেশপ্রেমের এবং বিশেষ অর্থে নিজের দেশ আর জাতির মুক্তিসংগ্রামের। বস্তুত 'সমর পোশাকে কোনো মানুষ যখনি মানবের মুক্তির সংগ্রামে নির্ভরচিত্ত, উৎসর্গিত তখন আনন্দ বিশাল আকাশ হয়ে যায়।' ('আনন্দ স্বরূপ')—এই উপলব্ধি এবং 'প্রয়োজন জনগণের ফুঁসে ওঠার, অ-বিপ্লবের সব কিছু কালনাগের মতো গিলে ফেলার ক্ষমতার, গরকির মতো সব জঞ্জালকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার প্রচণ্ডতার। প্রয়োজন দু'হাতে অস্ত্রধারণ করে দূষিত রক্ত ঝরানোর হিংস্রতার।' ('অক্ষমতা, তবু লিখে যেতে হয়')—এই স্বীকৃতিই এই কবিতাগুলি রচনা করতে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। এগুলি পাঠ করতে-করতে পাঠক-পাঠিকাচিত্তে চকিতে অনুভূত হয়, 'কোথাও ঘন কোথাও এলোমেলো…ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে… অনেকদিন থেকে, একটা মুক্ত প্রান্তরে পৌছনোর জন্যে' ('এমন কেউ নেই') দুর্মর এক অভিলাষ এই কবিতাগুলি রচনা করার সময় কবিচিত্তে বিশেষভাবেই জাগ্রত ছিল। এবং এই অভিলাষ যে তাঁর পক্ষে আদৌ ভাবালুতা-মাত্র নয়, এর আশু পূরণ যে তাঁর কাছে জীবন-মরণের সমস্যা সমাধানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক—এই বোধ তাঁর মধ্যে জলন্ত বলেই ওই একই কবিতায় তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন তোলেন, 'সামনে এগোবার সড়ক নির্মাণ করতে কি পারবো কোনোদিন? এই জঙ্গলাকীর্ণ মাটি কি অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে দেবার মতো একমুঠো বারুদ হয়ে যাবে না কোনোদিন?' কিন্তু শুধু ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন তুলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি; তাঁর সেই আর্ত প্রশ্নের উত্তর যে ইতিবাচক, সে-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তরের ইতিবাচকতার হেতু সম্পর্কেও তিনি সম্যক সচেতন,—যে-কারণে এই গ্রন্থের প্রথম ও নাম-রচনা 'লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা' কবিতায় কবিতার লোকটিকে তাঁর মানসপ্রতিভূ হিসেবে কল্পনা ক'রে পরম প্রত্যয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'তার সেই মনে হওয়াটা স্বপ্নের মতো ছড়িয়ে গেলো সবার ভেতরে'; এবং 'যেন সে স্থির বিশ্বাসে মনে করছে, তার পেছনে পাঁচ কোটি মানুষ।' অর্থাৎ, জাতীয় জীবনের চরম সঙ্কটের দিনে সমগ্র দেশের আপামর মানুষের সঙ্গে আত্মনাড়ীর সুদৃঢ় বন্ধনের গভীর এক অনুভূতি আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি রচনায় কবির অন্যতম প্রধান প্রেরণা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই উপলক্ষ, যা কবির এই প্রেরণার বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে? নিঃসন্দেহে জাতীয় সঙ্কটের সেই অন্ধ, মূক, বধির সময়পর্বই সেই উপলক্ষ যখন কবির মনে হচ্ছে, 'এখন বোধ করি এমনই একটা সময়—অতীত নিশ্চিহ্ন, বর্তমান অন্ধত্বের রূপকল্প, ভবিষ্যৎ অভিধান-বহির্ভূত।' ('আমার সামনে পেছনে'), যখন কবি অনুভব করছেন, 'সমস্ত শব্দাবলী বোবা হয়ে আছে—' ('প্রয়োজনের কথা'), যখন কবি বুঝতে পারছেন, 'দিনগুলো কেমন থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম। রাত-গুলো ফাঁকা রাস্তায় দৌড়ুচ্ছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ।' ('এই সময়') এবং যখন কবি বড়ো বেদনার সঙ্গে লক্ষ করছেন, 'ভেসে যাচ্ছে ছবির মতো গ্রামের নিসর্গ, জেলেদের মাছ, প্রকৃতি ললনাদের সতীত্ব, পৌরুষের গর্ব; ভেসে যাচ্ছে সমস্ত কৃতিত্বের খতিয়ান, আশ্বাসের দলিল, নদী-পয়োস্তির আকাঙ্ক্ষা।' ('এ কেমন ভাঙ্গন?') স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিচলিত বোধ করেছেন এই ছিন্নমস্তা সময়ের সুগভীর ষড়যন্ত্রে—ফলে 'এ কেমন ভাঙ্গন' কবিতায় তিনি বিমূঢ়ের মতো স্বগতোক্তি করে উঠেছেন, 'এ কেমন ভাঙ্গন!—শুধু ভেঙ্গেই চলেছে, ভেঙ্গেই চলেছে; কোনো চরের আবছা মানচিত্রও তো নেই।' এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ওই একই কবিতায় বিভ্রান্তের মতো আর্তকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন উঠিয়েছেন, 'এ ভাঙ্গন কি "বাংলার মানুষের আরো রক্ত চাই" বলে কোনো স্থপতি-প্রকৌশলীকে, নিদ্রায় অথবা জাগরণে, ডাক দিয়ে গেছে বর্তমান দুঃস্বপ্নের ভেতরে?' সঙ্গত কারণেই এই বিরূপ পরিস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছেন, নিজেকে তাঁর মনে হয়েছে, 'আমি এমন একটা ঘুড়ি, বাতাসের আন্দোলনে উড়তে পারি না।' ('সংশয়িত উপমা')।

কিন্তু এই সময়কে যারা কলুষিত করেছে, যারা এই সময়কে বাজি রেখে রাজনীতির জুয়াখেলায় মেতে উঠেছে, তাদের প্রতি শাণিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপেও কবি পিছুপা নন। সেই ভণ্ড রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গোক্তি—'শিকারের কাছাকাছি এসে বাঘেরা সন্তের পবিত্রতা ধারণ করে, ভালো ভালো হুংকার বলে, মহৎ গর্জনের ক্যাসেট বাজায়।' ('বাঘ ও শিকারের গল্প'), ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁদের প্রতি তাঁর নিবেদন, 'জনগণ শুধু আপনাকে একটি খবর বলবে না—আপনার…আস্তিনের তলায় কিরীচটা কিভাবে শানিয়ে রেখেছেন।' ('আপনি ও আপনার জনগণ'), জাতির সমূহ সংকটে এদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বক্রোক্তি—'আর ওদিকে কৃষ্ণ কিনা রুক্মিণীহরণে কালাতিপাত করে

চলেছে!' ('পূর্বাভাস')।

আলোচ্য গ্রন্থের' তৃতীয় মানবসন্তান' কবিতার 'বরফে ঢাকা গাছের পাতাগুলোতে হলদে চাঁদের শীতার্ত জ্যোৎস্না / গলে গলে পড়তে থাকলো।' এবং 'রাজা বাদশার গল্প' কবিতার 'বটগাছের ডালপালায় মস্ত বড়ো চাঁদের থালাটা কেমন আটকে গেছে' পংক্তিতে যেমন কবির নিসর্গ-চিত্রণ ক্ষমতা প্রকাশিত, 'এমন কেউ নেই' কবিতার 'নির্মাণ করতে করতে এগিয়ে যাবার সাধনায় কি যে বিষম পরিশ্রম!' 'এ কেমন ভাঙ্গন?' কবিতার 'নদীতে ভাঙ্গন এলে একদিকে নতুন চর জেগে ওঠে।' 'আনন্দস্বরূপ' কবিতার 'ক্ষেতের ফসল চপল শিশুর মতো নেচে ফিরলে কৃষকের বুকে লক্ষ্মীর ঝাঁপি;', 'সংশয়িত উপমা' কবিতার 'দীঘিতে কলসী ভাসালে সে কখনো হারিয়ে যাওয়া সুদূরে যেতে পারে না—' ইত্যাদি পংক্তিতে তেমনই তাঁর জীবনোপলব্ধির আভাস প্রতিভাত কিন্তু বিস্মিত হতে হয় গ্রন্থের শেষ কবিতায় ('অক্ষমতা, তবু লিখে যেতে হয়') যখন তিনি 'কবিতা দিয়ে কিছুই হয় না' বলে পৌনঃপুনিক ও প্রত্যক্ষভাবে কবিতার মূল্যহানি ঘটান, কেননা কবিতা সম্পর্কে এই মর্মান্তিকরূপে বিরূপ সিদ্ধান্ত কোনো কাব্যানুরাগীর পক্ষে কোনোক্রমেই গ্রহণীয় তো নয়ই, এমনকী বিন্দুমাত্র সমর্থনীয়ও নয়।

গ্রন্থটির মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা ত্রুটিশূন্য নয়॥

সুরম্য শব্দশিল্পের কবি

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতাকে শঙ্খ ঘোষ চিহ্নিত করেছিলেন পঞ্চাশের কাব্যধারার প্রাথমিক পর্বের 'শুদ্ধ ব্যতিক্রম' বলে। সেটা ষাটের গোড়ার দিককার কথা। যদিও অলোকরঞ্জন তখনো 'একলা স্বগতাকারে' মগ্ন এবং বলেন 'একটিমাত্র রাখাল থাক, / এ মাঠ একলা পড়ে থাক নীরবে, আমি এ মাঠ ছাড়বো না।' তবু তিনি বাচনে, ছন্দে, দার্শনিকতায় কিংবা নিজস্ব শৈলীর নিপুণতায় পঞ্চাশের সাধারণ স্বভাবধর্ম এড়িয়ে গেছেন। পরবর্তী কালে আরো প্রত্যক্ষভাবে 'বিবর্তমান কবিস্বভাবে'র দাবি মেনেছেন, নিজেকে ভেঙেছেন এবং নতুনভাবে গড়েছেন বহুপ্রসূ না হয়েও। তবু অন্তর্লীন এক ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেন নি। প্রসঙ্গত, অলোকরঞ্জনের অননুকরণীয় গদ্যের দ্বারস্থ হয়ে আমার উচ্চারণকে দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করা যাক,—'এক জলে যে দুবার স্নান করা যায় না, গ্রীক দার্শনিকের সেই বিপজ্জনক বীক্ষা আমাকে এখনো দুর্মরভাবে আকর্ষণ করে। একই কবিতার ধ্রুবপদের পৌনঃপুনিকতা যদিও বা গ্রাহ্য হয়, কবিতা থেকে কবিতার সঞ্চারপথে পুনরুক্তিপ্রবণতা যথাসাধ্য খারিজ হতে দেখলেই খুশী হই। আমার বিশ্বাস তবু আমাকে বলে, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও পারম্পর্য বলে কিছু আছে। স্রোতের ভিতরে ধ্রুবতার আদল ধরতে চাওয়ার মধ্যেও হয়তো কোনো তাৎপর্য রয়ে গিয়েছে।' অবশ্যই তিনি অনেক ধ্রুবপদ রচনা করেছেন আর তাতে ধ্রুবতার আদল ধরা পড়েছে নিখুঁতভাবেই, তবু 'পুনরুক্তিপ্রবণতা' খারিজ হয় নি সবসময়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং কথনশৈলীর দিব্যচারুতা নিশ্চয়ই মুগ্ধ করে কিন্তু কখনো-কখনো তাঁর নিজের ছায়াকে অনুসরণও লক্ষ্যগোচর।

প্রকাশিত দশটি কাব্যগ্রন্থের মোট ১১০টি আর অগ্রন্থিত আটটি নিয়ে সাকল্যে ১১৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠকবিতা'য়। নিসর্গ, ঈশ্বর, মা, প্রেমিকা, শিশু মোটামুটি এদের নিয়েই অলোকরঞ্জনের কবিতার জগৎ। যাকে সমাজসচেতন কবিতা বলে—যার ভাসাভাসা একটা চেহারা আমি প্রায়ই ধরতে ভুল করি—তেমন কিছু কবিতাও সংকলিত।

অলোকরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে: নাম "যৌবনবাউল"। তাতে মোট কবিতা ছিল ১০৮টি। কিন্তু নির্বাচক কবি মাত্র পনেরোটি কবিতা বেছেছেন। অন্যগুলির মধ্যে অন্তত আরো পনেরোটি আমার খুবই প্রিয় কবিতা। এই নিষ্করুণ নির্বাচনে আমার মতো অনেক কবিতাপড়ুয়াই আহত হবেন, কিন্তু 'মিতায়ত পরিসরে'র কথা ভেবে বিদগ্ধ কবি নানা পর্যায়ের প্রতিনিধিমূলক কবিতাগুলি সংকলিত করতে চেয়েছেন বলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। "যৌবনবাউলের" অনেক কবিতাই একদিন মুখে-মুখে ফিরত—যা আবেগী মানুষদের উদ্বেলিত করেছিল। প্রতারক স্মৃতির চোখ এড়িয়ে এখনো অনেকগুলি আমার সঙ্গী। সেই 'নির্জন দিনপঞ্জী'র ছিন্ন কবিতাগুলি মনে পড়ে ফিরে-ফিরে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা—নবার্ক, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৫৯। ১৯৮৫। কুড়ি টাকা

তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "নিষিদ্ধ কোজাগরী"র ৭৮টি কবিতা থেকেও মাত্র ১৬টি কবিতা গৃহীত। তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে একটু বেশিই নেওয়া হয়েছে। বলতে চাইছি শতকরা হিসেবের পটভূমিকায়।

অলোকরঞ্জনের কবিতার উপকরণ 'শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ' (কবির একটি প্রবন্ধের শিরোনাম এটি)। 'শব্দ' প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন লিখেছেন—'এক-একটি শব্দ, আজকের সময়ের বিশ্লিষ্ট মানুষের মতোই, এক-একটি ব্যঞ্জনাসঙ্কুল দ্বীপ'। বাচ্যার্থের দিকটি উপেক্ষা করে কবি শব্দকে 'ইঙ্গিতবঙ্কিম' করে তুলেছেন, প্রায়শই, সম্ভবত সবসময়ই। নানাদেশের, এদেশের বহুলপ্রচলিত মিথ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি ব্যবহার করেছেন প্রখ্যাত পূর্বজ সাহিত্যিকদের সৃষ্ট চরিত্র কিংবা তাঁদের গল্পকবিতার নাম বা অংশ, কিন্তু এ সবই তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ব্যঞ্জনা অথবা সম্পৃক্ত মাধুরী বাড়িয়ে দিতে। জীবনানন্দকে পুরাণপ্রয়োগের 'ত্রিকালজ্ঞ জাতিস্মর' বলেছেন অলোকরঞ্জন—তাঁর সে কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে হয়—তিনিও কম বড়ো জাতিস্মর নন। মূলত আধুনিক কবি যে mask বা 'মুখচ্ছদ ব্যবহার করেন তার পিছনে বর্ণাঢ্য ও জটিল অতীত রয়েছে।' সেই অতীতকে জেনে এবং সমসময়কে চিনে অলোকরঞ্জন অনুভবের সজলতার প্রেক্ষাপটে প্রজ্ঞাশাসিত উপলব্ধির উন্মোচন ঘটিয়েছেন। আর এর সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর ছন্দ-নির্মাণের অবাক কুশলতার। বাঙলা কবিতায় ছন্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরবর্তী পর্যায়ে এক অবিস্মরণীয় নাম। যাঁরা প্রবহমান গদ্যে নির্বাসিত ছন্দে লেখার পক্ষপাতী, তাঁদের অনেকেরই যুক্তি হল ছন্দ অনেকসময়ই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং যে শব্দটি ব্যবহার না করলে চলত, তাকে এনে ফেলতে হয় ছন্দের খাতিরে যা কবিত্বকে এবং কবিতাকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু অলোকরঞ্জন দেখিয়েছেন কেমন করে ছন্দ পোষা-বিড়ালের মতো তাঁর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করেছে। শব্দ নির্মাণে ও ব্যবহারে অপরিসীম দক্ষতা তাঁকে এমনিভাবে এক বিরল প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: '...বন্ধুকে দস্তানা / বানিয়ে নিয়ে কেন আমি প্রচণ্ড রোদ্দুরে / টাঙিয়েছিলাম প্রকাণ্ড এক স্নিগ্ধ সামিয়ানা? / দেবদারুডাল রোমশ হাতে ছেঁড়ে আমার সুযোগশুরু ডানা॥ / কিংবা 'অতিথি, তবু মুখে ঈষৎ রুক্ষ রাঢ় বুলি / তোমাকে খুব সাজে, / তোমার সাজি ভরে দিলাম কলকাতার ধূলি চোরে ও যুবরাজে / এ আন্ধারে ছিনিয়ে নেয় ভিখিরির মাদুলি / বৈরাগীর ঝুলি:' / অথবা 'আঁদ্রে জিদের জর্নালে দ্বিধা ছিল, / সংশয় থেকে সাহস পেলাম আমিও, / বুকে দুরুদুরু মৃদঙ্গ বিদারিল, / তথাপি সামনে এগিয়ে ছুঁলাম নীলাভ উত্তরীয়!'

পঞ্চাশের এই অন্যতম প্রধান কবির অলংকরণশৈলীর পটভূমিকায় একটি প্রশ্ন কিন্তু জাগেই। কেন তাঁর কথোপকথন এত সাজানো এবং সুচারু? তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য তাঁকে কি সহজভাবে কথা বলতে দেয় না? এটি হয়তো তাঁর সবলতারই দিক কিংবা এই জন্যেই তিনি শুদ্ধ ব্যতিক্রমী। তবু সমসাময়িক কবিতা কখন খুব প্রত্যক্ষ, বা বলা যায় রহস্যময়তার মোহিনী গুণ্ঠন কবিতায় উন্মোচিত হতে-হতে উপেক্ষিত, তখন অলোকরঞ্জনের মতো প্রতিভাময় কবির কাছে প্রত্যাশী হতে ইচ্ছে করে—সাংকেতিক সন্ধ্যাভাষা নয়—একেবারে সরাসরি সাধারণ ভাষায় লেখা কিছু কবিতা পেতে। ব্যক্তিগত আশা, আশাভঙ্গ, অপরাধবোধ এবং অজস্র অসম্পূর্ণতার জন্য যে যন্ত্রণা, তা উচ্চারিত হয় তাঁর কবিতায় অত্যন্ত পরিশীলিত আঙ্গিকে—কখনো-কখনো তা ভাঙাচোরা, এলোমেলো বিন্যাসের পক্ষপাতী হলে যেন ভালো লাগত। অলোকরঞ্জন কখনো নিঃশেষিত নন বলে তাঁর তন্ময় পাঠকের প্রত্যয়ও বিপুল।

চমৎকার প্রচ্ছদ করেছেন অপরূপ উকিল। তাঁকে অভিনন্দন।

এই সময়ের কবিতা : দ্রোহ, প্রতিবাদ, বিপ্লব ও আত্মসমর্পণ

কামাল হোসেন

ইস্তাহার সংকলন—মলয় রায়চৌধুরী। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগনা। ১৯৮৫। পৃ ৫৩। দশ টাকা

কবিতা-সংকলন—মলয় রায়চৌধুরী। মহাদিগন্ত। ১৯৮৬ পৃ ৪৬। সাত টাকা।

মেধার বাতানুকুল ঘুঙুর—মলয় রায়চৌধুরী। মহাদিগন্ত। ১৯৮৭। পৃ ৪৮। ছয় টাকা।

ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা—দেবী রায়। মহাদিগন্ত। পৃ ৪৮। সাত টাকা।

উন্মাদ শহর—দেবী রায়। ১৯৮৪। মহাদিগন্ত। পৃ ৪৮। সাত টাকা।

আবহ সংবাদ—রঞ্জিত সাহা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। ১৯৮৭। পৃ ৮০। নয় টাকা।

প্রতিবাদ যখন কবিতা—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, সুকুমার গরানী সম্পাদিত। সমন্বয়, ৪৪৬ পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০। ১৯৮৮। পৃ ৯৬। চোদ্দ টাকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবাদী কবিতা—অর্জুন গোস্বামী সম্পাদিত। সমীক্ষা, ২/৭৩ বিবেকনগর, কলকাতা-৭৫। ১৯৮৮। পৃ ৬০। দশ টাকা।

দামিনীকে রাখি ছেড়ে—সুভাষ ঘোষাল। প্রমা, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭। ১৯৮৬। পৃ ৩৫। ছয় টাকা।

পরিব্রাজকের ভিক্ষা—রবীন সুর। অরণি প্রকাশন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা। ১৯৮৮। ই. ৬৪। দশ টাকা।

হাত ধুয়ে ফেলছি হাওয়ায়—প্রশান্ত রায়। মাঝি প্রকাশনী, ৭ সুকিয়া রো, কলকাতা-৬। ১৯৮৫। পৃ ৬৪। ছয় টাকা।

রং নাম্বার—শৈলেন্দ্র হালদার। গ্রন্থ গৃহ, এ ৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। ১৯৮৮। পৃ ৪৮। বারো টাকা।

তুরের আগুন—শঙ্খচিল। ইসলামিক বুক সেন্টার, ২৭বি লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩। ১৯৮৬। পৃ ৬৮। নয় টাকা।

একশো পিদিম জ্বলে—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়সম্পাদিত। যুথিকা গঙ্গোপাধ্যায়, ৪ দোলগোবিন্দ সিংহ লেন, সালকিয়া, হাওড়া। ১৯৮৭। পৃ ৫৮। নয় টাকা।

প্রতিবাদী প্রতিদিন

ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসার-এর "ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম" বাক্য থেকে 'হাংরি' শব্দটিকে ১৯৬১ সালে একটি নির্দিষ্ট অর্থে প্রথম চিহ্নিত করেন তরুণ কবি মলয় রায়চৌধুরী। ঐতিহাসিক অসওয়াল্ড স্পেংলার-এর সাংস্কৃতিক অবক্ষয়-কালীন সর্বগ্রাস তত্ত্বে তখন হাংরি-ভাবনার দ্যোতনা অন্বেষণ করে ফিরছেন মলয়। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন স্বপ্ন-বিলাসী লড়াকু সৈনিক। এখন ভাবলে অবাক লাগে, এই স্বাধীন দেশেই ১৯৬৪ সালে প্রতিবাদী কবিতা লেখার জন্য ১২০ বি এবং ২৯২ দণ্ড সংহতির ধারায় মলয়কে হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধে গ্রেফতার করা হয়। মনে রাখা দরকার, সে সময় এদেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল না।

কী বক্তব্য ছিল হাংরি আন্দোলনের সংগ্রামী যোদ্ধাদের? ১৯৬১ সালে তাঁদের এক বুলেটিনে মলয় লিখেছিলেন, 'কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধবল্মীক নয়, নিরলস যুক্তি-গ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোন অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্যসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ-ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে!'

বলা বাহুল্য, বাঙলা কবিতার স্বনির্বাচিত পুরোহিতদের কাছে হাংরি আন্দোলনের এই বলিষ্ঠ বিদ্রোহ মোটেই সুখপ্রদ হয় নি। মলয়ের উপর মানসিক শারীরিক নানারকম অত্যাচার হয়েছিল। বস্তুত মলয় আর তাঁর দলবলের দুরন্ত বিদ্রোহ-বার্তায় তথাকথিত "অশ্লীলতা" নামক ট্যাবুতে আক্রান্ত আমাদের সাংস্কৃতিক কর্তাবাবাদের ভণ্ডামির মুখোশখানা চমৎকারভাবে খসে পড়েছিল।

এই আন্দোলনের সময়ে বিভিন্ন বুলেটিনে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত ইশতাহারগুলি আজকের পাঠকের কাছেও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। "মহাদিগন্ত" প্রকাশিত এই সংকলনগ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটি সংরক্ষণযোগ্য আকরগ্রন্থ।

মলয়ের কবিতার মধ্যে আমাকে চিরকালই মুগ্ধ করেছে তাঁর বিষতিক্ত বিদ্রূপ, ক্রোধ এবং অতৃপ্তিযন্ত্রণার তীব্র আবেগ। খুব নিষ্ঠুরভাবে ভারতবর্ষের উদ্দেশে তিনি তাই লেখেন : 'আপনি খুনের বদলে খুন করেন আর আমরা করলেই যত দোষ / আমাকে বেড়ালের খাবা মনে করবেন না / নিজের হৃৎপিণ্ড খেয়ে নিজের সঙ্গে রফা করে নিলে কেমন হয় / ভারতবর্ষ, ধানখেত থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নিন / পৃথিবীর সমস্ত মহৎগ্রন্থ পাঠিয়ে দিন ভিয়েতনামে, হোঃ হোঃ / দেখুন যুদ্ধ থেমে যায় কিনা / ভারতবর্ষ, সত্যি করে বলুন তো আপনি কী চান।' (কামড়)।

নারীর প্রেম আর বিশ্বাসভঙ্গের ইতিকথা নিছক কৌতুক আর ব্যঙ্গের মতো শিহরিত হয় এসব লাইনে : 'হায় স্ত্রীলোক থেকে থেকে স্ত্রীলোকের কাছে ছুটে গেলুম নিজের দুঃখকষ্ট চেপে রাখতে। প্রথম প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে এলুম তার প্রসবকালীন ছুটিতে' (জখম)।

শব্দের তির্যক দৃষ্টিপাতে কুয়াশার গভীরে নখের আঁচড়ে প্রতিবিম্ব রচনা করে মলয় লেখেন : 'বিমর্ষ নিস্তব্ধ ফাঁকা জেহোভার ঈষদচ্ছ সার রগে নখে / আমাকে স্পর্শ করো ওই ঠোঁটে ডাকাডাকি আরো কিছুক্ষণ আসি' (অন্তরঙ্গ বহির্মুখ)। 'মেধার বাতানুকুল ঘুঙুর' বেরিয়েছে গত বছর বইমেলায়। প্রকাশ কর্মকারের ড্রইং এবং যোগেন চৌধুরীর মলাটে সমৃদ্ধ মলয়ের এ সংকলনটি রীতিমতো অভিজাত। একজন জীবন্ত সৃষ্টিশীল মানুষ কীভাবে পালটিয়ে যান, এ সংকলনটি তার একটি বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ।

ক্রোধ, বিদ্রোহ এখন অনেকখানি শীতল। এসটাবলিশ-মেনটের অনিকেত অভিসারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গেছেন মলয়, এমন কথা বলব না। তবু অভিজ্ঞতার সর্পিল পথ অতিক্রম করে পর্বতশিখরে অপার নীলিমায় চোখ রাখবার অবসর হয়তো অর্জন করে ফেলেছেন।

বস্তুত এই পর্বের কবিতাগুলি আমাদের রাগায় না, প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ করে না। শুদ্ধ চেতনার রহস্য প্রতিস্থাপিত করতে গিয়েই হয়তো নিছক গবেষকের হিমায়িত কণ্ঠস্বরে এখন তিনি বলেন : 'সৌন্দর্য-বিমূর্ত কাথে মাছির খোরাক হবে তুমি / সব জড়ো করে তবু তুমি নও / তুমি সে সময়ে রৌদ্রে ভাসমান / বুঝেছিলে মিথ্যে এই প্রারম্ভিক অধঃপতন।' (শুদ্ধ চেতনার রহস্য)।

"ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ" লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মলয় বলেন : 'আমি চাই যে করেই হোক বেঁচে ওঠো / সমগ্র জীবন থাকো কথাহীন হয়ে।'

সেই একই আত্মসমর্পণের আওয়াজ শুনি : 'এবার রেহাই দিন তাড়াতাড়ি এই হ্যাপা শেষ করা হোক / কোথায় ঘোরাবো ঘানি কোন জেলে পাঠান সেখানে।' (নিক্তি)।

এই নির্লিপ্ত মোহময় জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে আবার প্রচণ্ড উৎসাহে বন্য ঘোড়ার কেশর ধরে এই নষ্ট বিধ্বস্ত সময়ের উপর দিয়ে মলয়কে ছুটে যেতে দেখলে আমার মতো অনেক পাঠক নিশ্চয়ই সুখী হবেন। হায়, সৃষ্টির গতিময় পাখি যে একই সরল রেখায় উড়ে বেড়ায় না।

হাংরি জেনারেশনের আর-এক সহযোদ্ধা ছিলেন দেবী রায়। দেবীর কবিতায় একটি নিজস্ব চরিত্র আছে। খুব উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে তিনি পছন্দ করেন না। বিবেকের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী এই কবি তাঁর কবিতার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের স্বাধিকার অর্জন করে নিয়েছেন। গতানুগতিক আশ্বাসে বিমুখ দেবীর অন্বেষণ সম্ভবত বিস্ফারিত দুটি আঁখির পিপাসাপীড়িত সন্নিধানে।

"ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা" কাব্যগ্রন্থের "ম নে রে খো" কবিতাটিতে সেই একই অঙ্গীকার প্রকাশিত হয়েছে : 'সব যন্ত্রণাই, একদিন নদী হয়ে দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ·· / ততোদিন শুধু একমনে নিজেকে খোঁড়ো··· ॥'

কবিতার হা ড় গো ড় কবিতাটিতেও রয়েছে এক নির্বিঘ্ন নির্লিপ্তি : কবিতার হাড়গোড়, ঠিক একদিন তার আগাপাস্তলা —চিবিয়ে খাবে /' আমরা যারা শুধুই হৈ চৈ, মদ্যপানই-সার / আমরা যারা শুধুই 'রেওয়াজ'—হয়তো তেমনভাবে 'রিয়াজত'।'

সময়ের এই বিষণ্ণ অবেলায় আনাচে কানাচে উঁকি মারে বিষাক্ত ছত্রাক। বিবিক্ত অস্তিত্বের চাবিকাঠি ছুঁয়ে ফিশফিশ করে দেবী উচ্চারণ করেন : 'সুখ নয়, ভিতরে তার অ-সুখ রয়েছে। খণ্ড-খণ্ড ইতস্তত, ছড়িয়ে রয়েছে / ছিন্নবিচ্ছিন্ন তুমি তাই ভয়ঙ্কর অসুস্থ—হয়ে পড়ো—' (কাতর—এক অস্থিরতা)।

"উন্মাদ শহর" কাব্যগ্রন্থে দেবীর কণ্ঠস্বর খুব একটা না পালটালেও কোথায় যেন খানিকটা বিদ্রূপের রেশ এসে মিশেছে। অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে আর কোনো সহানুভূতি খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। এক ধরনের অসহায় সহিষ্ণুতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে-যেতে তিনি লেখেন : 'এ কোথায় আমি চলে যাচ্ছি—কোথায়— / কেউ কোন উত্তর ছুঁড়ছে না কেন / সবি নিথর চুপচাপ—কেউ এখানে নেই' (কি এসে যায়)।

পৃথিবীর হাড়ে-হাড়ে অনুমিত খুন প্রকাশ পায়, দেবী তখন তাঁর বিদ্রূপশানিত চাঁচাছোলা গলায় বলে ওঠেন :

'মানিয়েছে— / দারুণ, দারুণ,—তোমার প্রেমিকাকে— পরস্ত্রীর চেহারায়' (তোমার প্রেমিকাকে)।

দেবীর এইসব সাম্প্রতিক কবিতায় মাঝে - মাঝেই নিরাসক্তির শীতল নগ্নতা প্রতিবেশে বড়ো বেশি বিষণ্নতা ছড়িয়ে যায়। খুব ক্লান্ত গলায় তিনি বলেন : 'বনশ্রী, আমি আজ এখন অ-নেক শান্ত হয়েছি / দুপুর রৌদ্রে, টো-টো করে সেই একটানা ঘোরা— / অস্থির বাউণ্ডুলেপনা, একে-একে প্রায় সব ছেড়েছি' (তুমি ঐভাবে)।

দীর্ঘদিন প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রঞ্জিত সাহা। এতদিন পর তাঁর কাব্যসংকলন "আবহ সংবাদ" প্রকাশিত হয়েছে—এটা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো খবর।

চারটি পর্বে কবিতাগুলিকে ভাগ করেছেন রঞ্জিত : স্বপ্ন, সময়, প্রত্যহ মানুষ করো, নিভৃত সংলাপ, বিচ্ছিন্ন আলাপ।

সময়ের এই ভ্রষ্ট লগ্নে সান্দ্র আলস্যে কবিতার শব্দ খোঁজেন না এই কবি। উপনিষদের শ্লোকে উচ্চারণের মতো মন্ত্রকণ্ঠে তিনি বলেন : 'বুকের শিলায় ভাঙছে সময় / চোখের মেঘে জমছে আগুন / এখন আমি দূরের বহুদূরের / ঢেউ নিয়ে খেলি' (স্বপ্ন ও সময়)।

তুলনামূলকভাবে "নিভৃত সংলাপ" পর্যায়ের কবিতাগুলি আমাকে রীতিমতো উৎসাহিত করে। প্রতিকূল বায়ুর শীৎকারে প্রজ্ঞার আহুতি বোধ করি সম্পূর্ণ হয়। একুশ শতাব্দীর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে-চলা মানুষকে ডেকে রঞ্জিত বলেন : 'কোথায় পালায় সব / পথভ্রষ্ট ছন্দছায়া— ঝড়ের তাণ্ডব / স্রোতস্বিনীর ছুটে যাওয়া, সাগর চলন / তরঙ্গের হাত ধরে বাঁধন ভাঙা / পথে পথে পাথর কুড়োনো' (কোথায় সব)।

শোকনিরপেক্ষ এক ভয়ঙ্কর পটভূমির নিবর্তিত বিষাদ আমাদের অস্তিত্বের শেকড় ধরে টান দেয় এসব কবিতার লাইনে : 'কোথায় লুকোবে এই শব্দহীন বিলাপ / দুঃস্থ সময় ছেড়ে কত কাল থাকবে তুমি / আত্মমগ্ন তপস্বীর বেশে' (কোথায় পালাবে)। কিংবা 'বেশ বলেছ—উপভোগ্যা বসুন্ধরা / সন্তানেরা তবু হামাগুড়ি দিয়ে কাঁদে' (পৃথিবী এত অসুন্দর নয়)।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ও সুকুমার গরানী সম্পাদনা করেছেন 'প্রতিবাদ যখন কবিতা' সংকলনগ্রন্থটি। খুব সঙ্গতভাবেই তাঁরা বলেছেন : 'কবিতাকে শেষ পর্যন্ত কবিতা হতে হয়; তা প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, প্রেম বা আত্মাভিমানের বিষয় সম্পর্কিত হলেও। ক্রোধ, চীৎকার, হতাশা, দীর্ঘশ্বাস, আনন্দ, বঞ্চনা প্রভৃতি যে-কোনো বিষয় কবিতার পটভূমিতে কাজ করতে পারে; কিন্তু একটি রচনা কখন কবিতা হয়ে উঠেছে তা যে-কোনো সচেতন পাঠকই বলে দিতে পারেন। প্রতিবাদ যখন ক্রোধ কিংবা চীৎকার মাত্র, শ্লোগান কিংবা বিজ্ঞাপন, তখন সেই প্রতিবাদ কবিতা হয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের রুচি, পছন্দ, আবেগ কিংবা মতাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও যে-কোনো কবিতাই শেষ পর্যন্ত কোনো-না-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।'

বয়স্ক ও নবীন বহু বাঙালি কবিকেই এই সংকলনগ্রন্থে টেনে এনেছেন সম্পাদকরা। বাঙালি কবিদের বুকের ভিতরে অন্যায়ের বিপক্ষে কত প্রতিবাদ কত বিক্ষোভ জমা রয়েছে, বিবেকের কাছে তাঁরা কতখানি সৎ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এ সংকলনগ্রন্থে চোখ বোলালেই তা বেশ বোঝা যায়। অনেকের কবিতা বেশ প্রচারধর্মী, অনেকের রীতিমতো ভালো কবিতা। আলাদা-আলাদা ভাবে আলোচনা না করে বেশ কিছু স্মরণ-যোগ্য পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি :

অমিতাভ দাশগুপ্ত : 'তুমি বলেছিলে : চাষ করো, ধান হবে। / মারী ও অপহ্নবে / জলে গেল মাঠ, জল নীল হল বিষে, / মা লক্ষ্মী, দুটি রাতুল চরণ / এখন রাখবে কিসে?' (চাল)।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক : 'এইসব চেয়ারেরও মাতৃভাষা আছে। অপমান আর অভিমান। চেয়ারই আদেশ দেয়, স্বপ্ন দেখে, সাম্রাজ্য বানায়। চেয়ারই রাস্তায় হাঁটে, বই লেখে, বক্তৃতাও দেয়।' (দেখা)।

কৃষ্ণ ধর : "একুশ শতকের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা আছে / জাতিসংঘের দরজার বাইরে / তারা প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে' (মানুষের দুঃখী সহোদর)।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত : শবযাত্রার সঙ্গীরা সব চমকে ওঠে / এক বিপুল সাভানায় / একটা ভোর শিশু / জন্মাচ্ছে মগজ আত্মা চোখ আর হৃদয় নিয়ে…' (জন্মান্তর)।

দেবারতি মিত্র : 'কিন্তু মেলামেশা শক্ত, অসম্ভব বলা ভালো, / কেননা অভূত আলো জন্ম নেবে যার পেটে / সে মা নেই আজও।' (অমিলিন)।

ধূর্জটি চন্দ : 'নত হতে জানি, কিন্তু কার কাছে? তাছাড়া / কেবল কজি করে যে ছিন্নভিন্ন / ঐ ধোঁয়াশার ম্লান কিংখাব, চেহারা / ক্রমশ স্পষ্ট, কাগজের টুপি জীর্ণ।' (ইস্তাহার)।

সুব্রত সরকার : 'আমি একটা বাজপড়া গাছের নীচে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থাকবো / এইসব সোনা-দানা, তপোবন ও উদাসীনতা আপনারা নিন' (আপনাদের জন্যে)।

মল্লিকা সেনগুপ্ত : 'দেখেছি শাদা কালো হলুদ রঙে তাকে / পিতৃভূমি তুমি আমাকে তৃণ ভাবো / শরীরে পলিমাটি আমার প্রিয় শাড়ি' (পিতার পৃথিবীতে)।

পূর্ণেন্দু পত্রীর মলাট এক কথায় লা-জবাব।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়ন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এবং এরই পাশাপাশি কালো মানুষদের রক্তঝরানো সংগ্রামের গৌরবময় ইতিকথাও আর-এক বাস্তব সত্য।

বস্তুত সংগ্রাম শুধু গণ-আন্দোলনের মিছিলে ময়দানে আবদ্ধ থাকে না, সংস্কৃতির বর্ণময় প্ল্যাটফর্মকেও ব্যবহার করতে হয়। "দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামের কবিতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে ব্যারি ফিয়েনবার্গ বলেছেন : 'সংস্কৃতিগত সুযোগ সুবিধা আর বহিঃপ্রকাশের পথ না থাকা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রে চরম সেন্সর ব্যবস্থা সত্ত্বেও, আগামী দিনের দক্ষিণ আফ্রিকার কণ্ঠস্বরের ভ্রূণ দেখা দিয়েছে; একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।'

এভাবেই এগিয়ে এসেছেন সাংস্কৃতিক মঞ্চের সব ধরনের সৈনিকরা। কবিরাও।

সুখের কথা, সেখানকার শত-শত প্রতিবাদী কবিতার মধ্যে নির্বাচিত কিছু কবিতার অনুবাদ বাঙলায় প্রকাশিত হয়েছে অর্জুন গোস্বামীর সম্পাদনায়। বিভিন্ন কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন অশোয়াল্ড আর মিশেল, বেনজামিন মোলায়েজ, ইলভা ম্যাকে, জিনজি ম্যানডেলা, ডেনিস ব্রুটাস প্রমুখ।

অনুবাদগুলি কতখানি মূলের অনুসারী হয়েছে, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে বেশ কিছু কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি খুব একটা পরিণত এবং প্রার্থিত মান অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। এক্ষেত্রে অনুবাদকের দায়িত্ব এবং ভূমিকা কতখানি, সেটাও যাচাই করা সম্ভব নয়।

তবে এই সুযোগে অন্তত বেশ কিছু যোদ্ধা-কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল—এটাও কম সৌভাগ্যের নয়। নেলসন ম্যানডেলার কন্যা জিনজি ম্যানডেলার লেখা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধার করছি : 'অদূরে দাঁড়ানো শহীদেরা / নিঃশব্দে মাথা নিচু করে / অভিবাদন জানায় / শৃঙ্খলাবদ্ধ / তাদের যন্ত্রণায়-বেঁকে-যাওয়া শরীর / তারা বসতে জানে না / একটা রক্তাক্ত কুয়াশার ভেতর / পিছিয়ে যেতে যেতে / পিছিয়ে যেতে-যেতে / সমাহিত স্বাধীনতার ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল / চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে বলে / আমাকে স্বাধীনতা দাও' (ম্যানডেলার প্রতিধ্বনি)।

কবি ও মেঘ

সুভাষ ঘোষাল এই সময়ের একজন পরিচিত কবি। "দামিনীকে রাখি ছেড়ে" কাব্যগ্রন্থে স্বরচিত কবিতার সঙ্গে কিছু অনুবাদ-কবিতাও জুড়ে দিয়েছেন। এটা তিনি কেন করলেন, ঠিক বোঝা গেল না। অনুবাদগুলিকে দিয়ে তো একটা আলাদা সংকলন প্রকাশ করা যেত।

দৃশ্যত এক অনুবন্ধী কৈবল্য স্বপ্নের কারাগারে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে ভালোবাসেন সুভাষ। তাই বোধ হয় রেখারিক্ত ভঙ্গিমায় শব্দ সাজিয়ে তিনি বলতে পারেন : 'এই বিপুল বাতাসের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে / আর কেউ না জানুক অন্তত আমি জানি / আত্মজীবনীর প্রতিটি পৃষ্ঠায় / আত্মা ছাড়া অন্য কোন বৈচিত্র্য নেই।' (অন্য কোন বৈচিত্র্য নেই)।

নাস্তি প্রত্যাখ্যাত ঐকান্তিক পরিশ্রমে সুভাষ ধ্যান করেন এক অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের। "সরস্বতী" কবিতায় খুব নাটকীয় গলায় তিনি উচ্চারণ করেন : 'নিজেদের অন্ধ জেনে আমাদের মতো যারা নবতম অন্ধকারে ঝরে / তাদেরই জন্য তুমি জলের ওপরে রাখো বীণার সজল প্রতিরোধ।'

অনুবাদপর্বে রয়েছেন উইলিয়াম ব্লেক (জন্ম : ১৭৫৭) ও এমিলি ডিকিনসন (জন্ম : ১৮৩০)। পুরোনো শতাব্দীর রোমন্থ স্বাদ কোনো মৌলিক বিদ্রোহ এনে দেয় না এই ছিন্ন-ভিন্ন উন্মার্গ পৃথিবীতে। তবু বুকের ভেতরে কোথায় যেন রস ঝরিয়ে দেয় ডিকিনসনের এইসব লাইন : 'আমি কেউ নই। কে তুমি বলো তো এবারে? / তুমিও কি কেউ নও? / তবে তো এখানে আমরাই এক জোড়া। / নির্বাক থেকো / জানলেই তারা পাঠাবে দ্বীপান্তরে।'

অতিদৈব বিশ্বের নৈমিষ শৈলশ্রেণী ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পথ হাঁটতে ভালোবাসতেন সদ্যঃপ্রয়াত কবি রবীন সুর। সময়ের প্রস্তরিত স্বপ্নদুঃস্থ ক্লৈব্য থেকে মুক্তিলাভের অভয়মন্ত্র অন্বেষণে

বোধহয় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন তিনি।

মৃত্যুর খুব কাছাকাছি সময়ে দাঁড়িয়ে কবির সৃষ্টির সমালোচনা নিঃসন্দেহে খুব কষ্টকর অভিজ্ঞতা। তবু বলতে হয়, স্বাবলম্বী চিত্রকল্পের বিচিত্র কোলাজ রচনা করতে রবীন ছিলেন রীতিমতো দক্ষ। জীবন এবং পৃথিবীর অন্বিত হিরণ্ময় পাত্রের প্রশ্রয়ী এক ধরনের সহজ দার্শনিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সব সময় আমরা লক্ষ করেছি। এভাবেই তিনি বলেছেন : 'চাঁদকে নেভাবে কে? কে জলকে ঠেলে দেবে সমুদ্রের ঠিক বিপরীতে / বোধন ও বিসর্জনে স্থিতপ্রজ্ঞ কবি শুধু বাউল সন্ন্যাস।' (কবি ও মেঘ)।

শব্দের মোহময় সম্মোহন মাঝে-মাঝে তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিত। চিরকালীন কিছু দুঃখ ও বিস্ময় প্রাণ ফিরে পায় এরকম কিছু ধ্বনিময় পংক্তিনির্মাণে : 'হাজার বছর রতিতৃপ্ত পর্বতের নুড়ি-নুড়ি দেহখানি। এখন ছড়িয়ে আছে অনাবৃত বুড়িগঙের যতদূর হাত-পা ছড়ানো।' (লুপ্ত প্রস্থান : নষ্ট প্রবেশ)।

প্রশান্ত রায়ের কাব্যগ্রন্থে আছে দুটি পর্ব : হাত ধুয়ে ফেলছি হাওয়ায় এবং ভাতের জন্য।

শব্দের নভস্তলে নিপুণ কারুকার্য ফোটানোয় দক্ষতা আছে প্রশান্তর। প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের গোধূলি উড়িয়ে ঘোড়া ছোটানোর তিনি পক্ষপাতী নন। মুগ্ধ চিত্রকল্পে টুকরো-টুকরো অনুভূতির পশরা সাজিয়ে গল্প শোনাতে তিনি ভালোবাসেন। গল্প মানে মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যক্তিগত পরাজয়ের, অবসাদের, ক্লান্তির কিংবা অলস কৌতূহলে দীর্ণ অভিজ্ঞতার গল্প।

নিজস্ব আইডেনটিটি খুঁজতে গিয়ে তাই হয়তো হতাশ গলায় তিনি বলেন : 'যুবক শব্দের পাশে কোনো পরিচয় বসে / হাটে-মাঠে-ঘাটে নদীর সহবাসে সবই অসম্পূর্ণ থাকে / আমিই আমার পরিচয়, এর বেশী নয়…' (পরিচয়)।

শৈলেন্দ্র হালদারের "রং নাম্বার" গ্রন্থটির ছাপা-বাঁধাই খুব সুরুচিপূর্ণ।

আসলে কবিতার রহস্যময় প্রতিবিম্বিত উপসাগরে সাঁতার কাটার উৎসাহ সব সময়েই প্রশংসাব্যঞ্জক। কোনো কবিকে নিরুৎসাহ করতে এই সমালোচকের সত্যিই ভালো লাগে না। শৈলেন্দ্র আরো লিখুন, লিখে যান। অনিবারণীয় ঋতুপরিবর্তনে একদিন তিনি নিশ্চিত খুঁজে পাবেন কবিতা-প্রতিমার নিঃশ্রেয়স নির্বাণ। আশা নিয়েই তো আমরা বেঁচে থাকি।

ঈশ্বর ও প্রত্যাখ্যান

ফুল পাখি প্রজাপতি প্রেমিকা কিংবা ঈশ্বর যে-কোনো বিষয় কবিতার ব্যথাস্তব্ধ প্রতিমার আত্মায় অধিষ্ঠান করতে পারে। সভ্যতার নির্ভার আবহে মানুষের ঈশ্বরচেতনা ও ধর্মবিশ্বাসের স্ফূর্ত সমারোহ যুগে-যুগে সব দেশের কবিতায় আমরা লক্ষ করেছি। চৈতন্যমুখর নাস্তির কিনারা অতিক্রম করে কোনো কবি নিবিড় ঈশ্বরপ্রেমের গান শোনাতেই পারেন। আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্বের গানে মাঝে-মাঝেই প্রেম এসে যায়। তাঁর ঈশ্বরপ্রেম আর নারীপ্রেমের মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব খুঁজে পান নি আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো দার্শনিক রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ।

অন্য সব ধর্মবিশ্বাসের মতো ইসলামি দর্শনচেতনাকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়েছে এক বিশাল বর্ণমুখর সাহিত্য এবং সৃষ্টির জগৎ। শ্রেয় ও প্রেয়র দুর্নিরীক্ষ্য আধ্যাত্ম সংঘাতে কবির কল্পনালতায় সংবৃদ্ধ হয়েছে ইসলামের নিবিড় বিশ্বাস।

ইসলামি সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক জেমস ক্রিট্‌জেক বলেছিলেন : 'Islamic literature, at any rate, a literature of contrasts. It is a literature of scepticism and blind faith. It is a literature of economy and lavishness. It is a literature of strict form and hackneyed theme. Within so supple and even unwieldy a literature, the uninitiated reader will want to proceed cautiously and in possession of some maps' (Introduction to Anthology of Islamic Literature).

দেশে-দেশান্তরে ইসলামি দর্শন-ভাবনায় পরিপুষ্ট সাহিত্যের নানাবিধ বৈচিত্র্য বিভিন্ন সময়ে আমাদের মুগ্ধ করেছে। বাঙলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম থেকে ফররুখ আহমদ পর্যন্ত এ ধারার একটি সজীব প্রতিশ্রুতি আমরা লক্ষ করেছি। সম্প্রতিকালে আল মাহমুদের মতো শক্তিমান কবির কবিতায় ইসলামের যে আধুনিক বীক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্য ধর্মের মানুষের কাছেও তা সমান আকর্ষণীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিষয়বস্তু যাই হোক, নির্মাণ এবং আঙ্গিকে কবিকে অর্জন করতেই হবে সমকালীন রচনারীতির কুশলতা আর সম্ভ্রম। দুঃখের বিষয়, কবি শঙ্খচিলের কাব্য-প্রয়াস মহৎ হলেও শিল্পসৃষ্টির এই প্রাথমিক শর্তটুকু অনুসরণ করার চেষ্টা করেন নি। 'তূরের আগুন' হচ্ছে সেই আগুন যার মাধ্যমে তূর পর্বতে হজরত মুসার (বাইবেলের মোজেস) সঙ্গে ঈশ্বর বাক্যালাপ করেন। শঙ্খচিলের ইচ্ছে ছিল সেই অলৌকিক সাক্ষাৎকারের রেশটুকু কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার। অর্থাৎ কিনা কবিতার শ্রুতিময় অগ্নিনির্যাস থেকে এক অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক অনুভূতি পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া।

হায়, সাধ আর সাধ্যের মধ্যে বিরাট ফাঁকি থেকে গেছে। গুটি কয়েক ইসলামি শব্দ আর মিথের ব্যবহার করলেই ইসলামি দর্শনকে কবিতায় স্থাপন করা যায় না।

আমরা জানি, সাহিত্যের উত্তরাধিকার বলে একটি বস্তু আছে। কিন্তু এখনো যদি কেউ তাঁর কবিতায় নজরুল ইসলাম কিংবা সত্যেন দত্তকে নির্বিবাদে গ্রহণ করেন, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবির ছন্দের হাতও খুব দুর্বল। আধুনিক বাঙলা কবিতার উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে নিজেকে নতুনভাবে তিনি আবিষ্কার করুন—এ প্রার্থনা করি।

নন তিনি ননসেন্‌স

সুকুমার রায়ের একশো বছর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেরিয়েছে পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ছড়াসংকলন "একশো পিদিম জলে"। ভালো লাগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, মৃদুল দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সামসুল হক, কাতিক ঘোষ, কিন্নর রায়, মুস্তাফা নাশাদ, সুখেন্দু মজুমদার প্রভৃতিদের ছড়া। প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছড়াটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

যা লিখেছ
শুনতে আবোল তাবোল
নেই কো কোনো মানে,
মুক্তো হেন
গভীর কথাটুকু
লুকিয়ে আছে
তার যে মাঝখানে !!

চিত্রী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ

সমীর ঘোষ

১৯৮৮ ২১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৯ ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত বিড়লা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হল শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চিত্র এবং ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। শিল্পীর মৃত্যুর পর এই প্রথম এত বড়ো প্রদর্শনের আয়োজন হল যা এ পর্যন্ত ভাবতে কখনো হয় নি। দেবীপ্রসাদের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব যত বেশি প্রচারিত, ঠিক ততখানি তাঁর শিল্প প্রদর্শিত বা প্রচারিত নয়। প্রদর্শনী দেখে সেই কথাই নতুন করে মনে পড়ল।

এক দেবীপ্রসাদ নানা দেবীপ্রসাদে ছড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, শিকারে পটু, বাঁশি বাজানোয় দক্ষ, সাহিত্যের উৎসাহী রচনাকার। ভাস্কর্য আর চিত্ররচনায়ও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। এত সব গুণের সমাবেশে অনেকাংশেই তিনি রোমান্সের নায়ক হয়ে উঠে-ছিলেন। কিন্তু এই নানাবিকাশের বৈচিত্র্যে তাঁর শিল্পসজনের প্রকৃত তাৎপর্য প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অথবা মূল আলোচনা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে তিনি হয়ে ওঠেন রূপকথার নায়ক। বিড়লা একাডেমীর প্রদর্শনীতেও নানা দেবীপ্রসাদকেই উপস্থিত করার চেষ্টা ছিল। চিত্র এবং ভাস্কর্যের বাইরে তাঁর চিঠিপত্র, সাহিত্যসম্ভার, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, নানান প্রশংসাপত্র, এবং নানা টুকিটাকি। তবে দু-একটি চিঠি ছাড়াও বেশ কিছু ফোটোগ্রাফ এবং পুরানো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শিল্প-সম্বন্ধীয় চিত্র-আলোচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান।

দেবীপ্রসাদের পূর্ব সময় পর্যন্ত ভাস্কর্যের চরিত্রনির্ণয়ে অনেকেই 'ঔপনিবেশিক' চিহ্নে চিহ্নিত করেন। এই সময়ের ভাস্কর্যের রূপারোপে স্থূলরুচির বাবুয়ানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিম্নমানের গ্রীসীয়-রোমক নকলনবিশি। বাড়ির অন্দর বা বাগান সাজানোর জন্যই এই মূর্তিগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। এ ছাড়াও সাহেবদের প্রয়োজনে বড়ো-বড়ো শহরে শাসক এবং দেশী-বিদেশী কৃতী পুরুষদের আবক্ষ এবং পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের চল হয়েছিল। গত শতকে কিছু-কিছু ভারতীয় তরুণ ভাস্কর্য-শাস্ত্র হাতে-কলমে শিক্ষা করার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। এঁদের কাজেও বিলাতি প্রথার অনুকরণের সঙ্গে মিশেছিল তীব্র আবেগ এবং বিলাসী সস্তা চাহিদার প্রভাব। স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে "ভারতীয়" ভাবনার বিকাশকালেও কিন্তু নব্য ভাস্কররা ভারতীয় ভাস্কর্যের অতীত-গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি দেন নি। এমনকী অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চায় ভারতীয় বোধ যেভাবে কাজ করেছিল, এবং সেই ভাবনার সোৎসাহ সমর্থন যেভাবে এসেছিল, ভাস্কর্যের নব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে তা ছিল অনুপস্থিত।

দেবীপ্রসাদই ভারতবর্ষের প্রথম ভাস্কর যিনি শুধুমাত্র কর্মশক্তি নয়, মননদর্মিতাকে ভাস্কর্যে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রতিকৃতি ও স্মারক-ভাস্কর্য তুলনায় সংখ্যাধিক হলেও তাঁর ব্যক্তি-অনুভবের স্বীয় ভাবনার প্রকাশও রয়েছে কিছু সৃষ্টিশীল কাজে। দেবীপ্রসাদের পূর্বেও শক্তিমান ভাস্করের আবির্ভাব ঘটেছে ভারতে। বিশেষত বাঙালি ভাস্কর হিসেবে যদীন্দ্রনাথ বসু, প্রমথ মল্লিক, হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাজে শক্তি এবং অনুভব দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু দেবীপ্রসাদের কাজেই আমরা প্রথম পাই বিলেতি প্রথাগত নৈপুণ্যের পাশে আটপৌরে জীবনের স্বাভাবিকতার ছোঁয়া। মন্থন পেলবতার পাশে আবেগের রূঢ় বুনন। শুধু রূপে নয়, ভালোবাসায় তিনি ধরতে চেয়েছিলেন ভাস্কর্যের গড়নকে।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কাছেই দেবীপ্রসাদের ছবি আঁকার হাতেখড়ি। পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনের শিক্ষানবিশি হয় ইতালীয় শিল্পী বয়েসের কাছে। দেবীপ্রসাদের ছবির ক্ষেত্রে এই দুই গুরুর প্রচ্ছন্ন প্রভাব দৃষ্টি এড়ায় না। অবনীন্দ্রনাথের ছবির রঙ, বিষয়ের উপস্থাপনভঙ্গি এবং স্বপ্নকল্পময় আবহ নির্মাণ দেবীপ্রসাদের ছবিতেও এসেছে নানা সময়ে বিচিত্র রূপারোপে। আবার তথাকথিত 'বেঙ্গল স্কুল' ঘরানার পেলব কোমল কিঞ্চিৎ বিকৃতিকরণের বিপরীতে পাশ্চাত্য শরীর-সংস্থানের যথাযথ উপস্থাপনকে ভারতীয় জলহাওয়ার রোমানটিক মেজাজে রূপান্তর দেবীপ্রসাদের ছবির লক্ষণ-চিহ্নে চিহ্নিত। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রকরণের প্রভাবে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই অবনীন্দ্রনাথের লক্ষমতা বা শিল্পবোধের পূর্ণতা ছিল না। ফলে ভাব এবং

আঙ্গিকের বাহ্যিক অনুকরণ সম্ভব হলেও তাতে অন্তিত্বের স্বতন্ত্র সত্তাপ্রকাশ সম্ভব হয় নি। শুধুমাত্র কিছু দুর্বল ছবি ছিদ্রান্বেষী সমালোচকগণের উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে রয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথের নিন্দায় এগুলিই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেবীপ্রসাদের ছবি এর ব্যতিক্রম। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তিনি বুঝে নিয়েই স্বীয় পরিমণ্ডলের বিষয়কে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। শিল্পী নিজেই বলেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথ রাঁচি, দার্জিলিং মুসৌরী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। বহুদিন পরে সেখানকার কোনো নৈসর্গিক অনুভূতি কোনো এক ছবির বিষয়বস্তু হয়ে স্থান পেয়েছে। আমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। যখনই যা দেখি, মন যা নেয় তখনই তা ছবিতে ফুটে ওঠে। কোনো এক বর্ষণমুখর সকালে সারারাত বৃষ্টিতে ভেজা একটি কাকের অসহায় করুণ অবস্থা আমাকে বেদনা দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তা ছবিতে এঁকেছি।'—এই উক্তির সত্যতা তাঁর বহু চিত্র-ভাস্কর্যেই ছড়িয়ে আছে। কাহিনী বা আখ্যান নির্ভর স্বকল্পনার ছবি যে তিনি আঁকেন নি তা নয়, কিন্তু সেখানেও বস্তুরূপের সাদৃশ্যমিতা, রক্তমাংসের অনুভূতি অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল। বস্তুরূপের গঠন-দৃঢ়তা, আলো-ছায়ার মায়াবী উদ্ভাস, উজ্জ্বল বর্ণ এসবই নিছক ভারতীয় শৈলীর অন্ধ বা সংকীর্ণ বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকে নি, বরং তা ইউরোপীয় শৈলীর কথাও স্মরণে আনে। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতেও এ প্রভাব বেশ স্থ্যাপক।

প্রদর্শনীর বেশ কিছু কাজ দেবীপ্রসাদের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের যোগ্য পরিচয়বাহী। যেমন, Pilgrim (34), Musafir (14), Two Peacocks (35), Life in Huts (17), Mother and Child (15), A Man under a Bamboo Tree (13) প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে ১৭ নম্বর ছাড়া সবগুলিই জলরঙে আঁকা। অবশ্য সবগুলি একই পদ্ধতিতে নয়, বিভিন্ন প্রয়োগকৌশলে ভিন্ন-ভিন্ন মেজাজ তৈরি হয়েছে। কখনো ভিজে জমিতে রঙ ছেড়ে হালকা রঙের বিস্তারী আভাস এনেছেন, কখনো ধোয়া-পদ্ধতির প্রয়োগে বিভিন্ন টোন বা পরদায় বিন্যস্ত আবহে ছবির রোমানটিক মেজাজ ফুটে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ধোয়া বা ওয়াশ ছবিতে তিনি বিষয়বস্তুকে অনাবশ্যক রঙের আবেশে তলিয়ে যেতে দিতেন না। বরং বিষয়ের প্রয়োজনে যথাযোগ্যতার প্রতি অনুগত হয়েই পরিবেশ রচনা করতেন। এতে বর্ণের মালিন্যের পরিবর্তে আলো-আঁধারি জাদু তৈরি হত। এরকম একটি ছবির প্রকৃষ্ট উদাহরণ "প্রবাসী" পত্রিকায় মুদ্রিত ছবি 'স্মরের পরশ'। প্রদর্শনীতে অবশ্য মূল ছবিটি ছিল না। এমন অনেক ছবিই মূলের পরিবর্তে মুদ্রণের স্বাদেই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। কালো কালিতে আঁকা কিছু ছবি ছিল যা দেবীপ্রসাদের প্রকাশভঙ্গিমার স্বতন্ত্র পরিচয়ের বাহক। এগুলিতে শুধু গঠনদৃঢ়তাই নয়, জৈব সত্তার সোচ্চার প্রকাশও ঘটেছে। ৩৫ নম্বর ছবিতে দুটি ময়ূরের ভঙ্গির চিত্রায়নে জলরঙের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই ছবির গঠনে যে নিবিড় সুক্ষ্মতা এবং বর্ণদ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে তা অবশ্যই দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদের বেশ কিছু কাজ বিষয় ও প্রয়োগগত দিক থেকে অনেকের কাছেই হয়তো অতিমাত্রায় আবেগ বা স্থূলতার ছায়া নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু তৎকালীন চিত্রচর্চার প্রেক্ষাপটে এই ছবি অবশ্যই সময়ের দলিল হিসেবে ভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত হবার যোগ্য। দেবীপ্রসাদের ছবির বাস্তবতা শুধু গড়নে নয়, বস্তুর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের প্রতিও ছিল সমান সজাগ। তেলরঙেও শিল্পী ছিলেন সমান দক্ষ। যদিও এই প্রদর্শনীতে জলরঙের তুলনায় তেলরঙের ছবির মান খুব ভালো ছিল বলে আমার মনে হয় নি। একটি কাজে তাঁর দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। At Rest নামের ছবি। এতে স্বল্প আয়োজনের নদীতে নৌকায় অবস্থান এবং মাঝির বিশ্রামের চিত্র যেন শুধু বিষয়ে নয়, উপস্থাপনার সারল্যে এবং রঙ ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততায় আশ্চর্য হতে হয়। এই ছবিতে যেন ইম্প্রেশনিস্ট রীতি ছায়া ফেলে। শুধু বিচারের তাগিদেই বিদেশী রীতির তুলনা করছি না। আঙ্গিকের ব্যবহারে যে সাফল্য, তাতে তাঁর দূর-বিস্তারী ভাবনারই প্রশংসা করতে হয়। Puza (38) নামের ছবিতে 'বেঙ্গল স্কুলের' রীতিতে আঁকা ছবিটিও তাঁর বিচিত্র পদ্ধতিরই উদাহরণ। এই ছবিটি টেম্পারায় আঁকা। মিউরালধর্মী এই ছবিটিতে পাশ্চাত্য বাস্তবতার কঠিন নিয়ম না মেনে স্বাভাবিক সরলতাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্রাঙ্কণ বৈশিষ্ট্য থাকলেও বিষয়ের কারণে কোনো বস্তুই বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। ফলে সমগ্র পটে একটা ছন্দময় ভাবসাম্য তৈরি হয়েছে। অথচ অঙ্কনের সারল্যেও বাস্তবতার দৃঢ় ভূমি ভেঙে পড়ে নি।

চিত্রের মতো ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও দেবীপ্রসাদ সমান রোমানটিক এবং নাটকীয়। আগেই বলেছি 'ভারতশিল্পে'র যে ভাবনা অবনীন্দ্র-ভাবুকদের নাড়া দিয়েছিল তার প্রভাব

বা ভাবনার লেশমাত্র ছিল না সমসময়ের ভাস্কর্যে। ফলে মানবিক আবেদন বা নাটকীয়তা থাকলেও বিষয়ের রূপারোপে বা উপস্থাপনায় এবং নির্মাণকৌশলে পাশ্চাত্য ভঙ্গির প্রভাব বেশ প্রকটই ছিল। দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্যের রূপারোপে দেশজ প্রকৃতি প্রথম প্রকাশ পায়। ভাস্কর হিরণ্ময় রায়-চৌধুরীর কাছেই তিনি ভাস্কর্যের পাঠ নিয়েছিলেন। আমার ধারণা, দেবীপ্রসাদ চিত্রচর্চার পথ বেয়ে ভাস্কর্যে আসেন বলেই হয়তো তাঁর ভাস্কর্যে চিত্রের গঠন ও আখ্যানভঙ্গির একটা ক্ষীণ প্রভাব বরাবরই কাজ করেছে। যদিও তাঁর কমিশনের কাজের সংখ্যাই বেশি এবং এর মধ্যে বেশির ভাগই পোরট্রেট, তবু যে-কটি কম্পোজিশন তিনি করেছেন তা অবশ্যই বিশিষ্ট। ভাস্কর্যের মধ্যে When Winter Comes, My Father, Triumph of Labour প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয় অনুযায়ী যে অভিব্যক্তি কাজটিতে আছে তার প্রত্যক্ষ আবেদন যেমন সাধারণ দর্শককে তৃপ্ত করে, পাশাপাশি এই অভিব্যক্তি প্রকাশে শিল্পের গঠনগত কৃৎকৌশলও লক্ষণীয়। শরীরসংস্থানের দৃঢ় গঠনের সঙ্গে আছে বাহুল্যবর্জনের চেষ্টা। সমগ্র গঠনে বাস্তবতার চূড়ান্ত লক্ষণগুলিকে রেখে বাকি অনাবশ্যক ডিটেল-গুলিকে তিনি বর্জন করেছেন যা এই প্রদর্শনীতে My Father নামের বিশিষ্ট কাজেই সম্পূর্ণ মেলে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রঁদ্যাঁর প্রভাব মনে এলেও এখানে দেবীপ্রসাদের উপস্থাপনের স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। Triumph of Labour নামের বহুখ্যাত ভাস্কর্যের আখ্যান এবং উপস্থাপনার চমক প্রবল। এই ভাস্কর্যেও শিল্পী দেবীপ্রসাদ ভাস্কর দেবীপ্রসাদকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই কম্পোজিশনে আবেগ যত ব্যাপক নাটকীয় আবহ যত নিবিড় সে তুলনায় শিল্পব্যঞ্জনা কম। অর্থাৎ শরীরী উপস্থাপনায় চূড়ান্ত ডিটেল যেভাবে ব্যবহৃত তা ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়ের গাম্ভীর্যকে আহত করে। অবশ্য এসবই বর্তমান সময়-প্রেক্ষিতে রুচিভঙ্গির ভিন্নতা মাত্র। দেবীপ্রসাদের বিভিন্ন ভাস্কর্যের মধ্যেই কোনো না-কোনো ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল আগামী আধুনিক ভাবনার মুক্তি। ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্তের কথনে কিছুটা সত্যি অবশ্যই আছে। তাঁর মতে—'He did not either make any effort towards innovating a new synthesised formal image pertaining to the contemporary world. This may be due to fact that in his later period he was over-burdened with commission works of popular appeal which possibly distracted him from his creative path. This indeed is a national tragedy.' এ অপ্রিয় সত্য মেনে নিয়েও বলা যায়, একদিকে অবনীন্দ্রধারার বিশেষ রীতিপদ্ধতিকে তিনি এক স্বতন্ত্র যুক্তি ও রীতির দৃঢ়তায় শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে-ছিলেন, অন্যদিকে ভারতীয় ভাস্কর্যের নব্য রূপায়ণে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর সাফল্য।

মতামত

১

গোরবাচেভের বিশ্বদর্শন

মিখাইল গোরবাচেভের "পেরেসত্রোইকা: আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর জন্য এক নতুন চিন্তা" দুনিয়া জুড়ে এক আলোড়ন তুলেছে। তাঁর ঘোষিত বৈদেশিক নীতির সাফল্য 'আংশিক নিরস্ত্রীকরণ' ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতির ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সূচিত হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই গোরবাচেভের বৈদেশিক নীতি আমাদের মনোযোগ দাবি করে, এবং অল্প কথায় হলেও এই নীতির পর্যালোচনা একটা জরুরি কর্তব্য হয়ে ওঠে।

দুনিয়াকে নতুন চোখে ফিরে দেখা

কীভাবে দেখছেন গোরবাচেভ গোটা দুনিয়াটাকে? তাঁর 'নতুন চিন্তা' অনুযায়ী—'বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত নতুন ধারণাটি ২৭তম পার্টি কংগ্রেসে বিশদ করে উপস্থাপিত হয়েছে···ধারণাটি হল বর্তমান বিশ্বে দেশগুলির মধ্যে সবরকম প্রগাঢ় (profound) দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও, সবরকম মৌলিক মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, দেশগুলি **আন্তঃসম্পর্কিত, পারস্পরিক নির্ভরশীল এবং বিশ্ব অখণ্ড।**[১] [মোটা হরফ লেখকের]

বর্তমান বিশ্বকে এইভাবে 'নতুন চোখে' দেখা কতটা বিশ্ববিকাশের মার্কসবাদী সূত্রায়ণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? সাধারণভাবে, দেশগুলির আন্তঃসম্পর্ক, নির্ভরশীলতা এবং অখণ্ড বিশ্ব-র ধারণা মার্কসবাদবিরোধী নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, গোরবাচেভ কীভাবে এই অখণ্ডতাকে বোঝাতে চাইছেন? তিনি বিশ্বের বর্তমান দ্বন্দ্বসমূহ, মৌলিক মতপার্থক্যসমূহের বিপরীতে আন্তঃসম্পর্ক, নির্ভরশীলতা এবং অখণ্ডতাকে উপস্থাপিত করেছেন। যেন, দ্বন্দ্ব-পার্থক্য এসব গৌণ; এবং নির্ভরশীলতা, অখণ্ডতা এগুলো মুখ্য।

কিন্তু বিকাশের নিয়মে এই যে বর্তমান অখণ্ডতা, তা কি স্থায়ী? অথবা, বিশ্বের বর্তমান অবস্থানের মূল চালিকা শক্তি কী? দ্বান্দ্বিক বিচারে 'দুই বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রামে' সংগ্রামই চালিকা শক্তি। ঐক্য অস্থায়ী, সাময়িক; সংগ্রাম শাশ্বত। সুতরাং, বিশ্ববিকাশের যেটি মুখ্য চালিকা-শক্তি, তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে, তার মৌলিক বিরোধ-গুলিকে খাটো করে তার বর্তমান অবস্থানের ঐক্যের দিকটিকে অর্থাৎ বর্তমান 'অখণ্ড' অবস্থানের ওপর জোর দেয়া আদৌ দ্বন্দ্বপ্রগতিতত্ত্ব অনুযায়ী বিকাশের সূত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। বরং তার বিপরীতে, বিশ্ববিকাশের পরিবর্তে গোরবাচেভের 'নতুন চিন্তা' বিশ্বে বর্তমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই ওকালতি করে।

কিন্তু কেন দুনিয়াটাকে বিকাশের মৌল-সূত্রের বাইরে রাখার প্রয়োজন হয়ে ওঠে গোরবাচেভের? কারণ, তাঁর নিজেরই কথায়, 'এর প্রধান কারণ হল, মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যাটি। এ-সমস্যায় আমরা জড়িয়েছি, কারণ নিউ-ক্লিয়ার অস্ত্রসম্ভারের বিকাশ এবং তা প্রয়োগ করার হুমকি মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।'[২]

সুতরাং, বিপন্ন অস্তিত্বের তাড়নায় গোরবাচেভ 'মানবতা'কে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে এবং 'সহজাত বুদ্ধি'-র অনুসারী হয়ে 'ঘোলামেলা' হতে বলেছেন।

তাঁর 'নতুন চিন্তা'র সারকথা—পৃথিবী আর-একটা যুদ্ধের ভার বইতে পারে না, কারণ নিউক্লিয়ার যুগে আর-একটি যুদ্ধের অর্থ-ই হল ধনে-প্রাণে-মানে সমূহ বিনাশ। বিনাশের হাত থেকে পৃথিবীকে তথা মানবসভ্যতাকে রক্ষার খাতিরে আমাদের পুরনো অনেক ধারণা প্রয়োজনে ত্যাগ করতে হবে। নতুনভাবে ভাবতে গেলে, যুদ্ধ-শান্তি-বিপ্লব সম্পর্কিত এত-দিনকার প্রচলিত ধারণাগুলিকে 'সেকেলে' বলেই ধরতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গোরবাচেভের 'নতুন সূত্রায়ণে'র পেছনে কাজ করছে নিউক্লিয়ার-যুদ্ধ-ভীতি।

তাঁর এই ভীতির বনিয়াদ কতটা দৃঢ়? ১৯৪৫-এ আমেরিকা প্রথম পারমাণবিক বোমা ফেলে জাপানে। তারপর ৪৩ বছর কেটে গেছে। অনেক সংকট ঘনিয়েছে, অনেকবার এ-বিশ্ব পারমাণবিক যুদ্ধের উপান্তে পৌঁছেছে। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ হয় নি। ১৯৪৯-এ চীন দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করে। ১৯৫০-এ কোরিয়া, ৬০-এর দশকে কিউবা, ভিয়েতনাম-এর মুক্তিকামী মানুষ মার্কিন সাম্রাজবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। পরাজিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু কোথাও পারমাণবিক বোমা ফেলে নি, ফেলতে সাহস পায় নি।

বিশ্বযুদ্ধ আর-একটা বাধে নি সত্যি, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 'আঞ্চলিক যুদ্ধ'-র ধারাবাহিকতাতে কখনই ছেদ

পড়ে নি। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নানা অঞ্চলে গোটা বিশ্ব আজও এক রণাঙ্গন। আর এ-সমস্ত 'আঞ্চলিক যুদ্ধে' সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও কাজ করছে। কিন্তু কোথাও কোনো নিউক্লিয়ার-শক্তিই তার তথাকথিত 'চরম মারণাস্ত্র' প্রয়োগ করছে না। কেন করছে না, তার অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করেছিলেন বলেই মাও-সেতুঙ সাম্রাজ্যবাদকে 'কাগুজে বাঘ' বলতে দ্বিধা করেন নি।

মূলধনী ব্যবস্থা শ্রমিকের শ্রম নিঙড়ে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে যেমন, একই উদ্দেশ্য তাকে যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে বাঁচিয়েও রাখে। ঠিক সেইভাবেই সাম্রাজ্যবাদ তার অতি-মুনাফার স্বার্থেই বিশ্বের বিশাল বাজারকে নিশ্ছিদ্র করে দিতে পারে না - কারণ, সেটা করার অর্থ তার নিজেরও অস্তিত্বের বিলোপ। সাম্রাজ্যবাদ আর যাই হোক বন্ধ-উন্মাদ নয় যে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ-অস্তিত্ববিলোপে তৎপর হবে।

আরও এক দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা যায়। পারমাণবিক বোমা যতদিন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত ছিল, ততদিন এটা দেখিয়ে গোটা দুনিয়াকে ব্ল্যাকমেল করা হয়তো-বা অনেকটাই সম্ভব ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে পারমাণবিক অস্ত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটল সেদিন থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্ল্যাকমেল করার ক্ষমতাও আর রইল না। কারণ, বিশ্বের অনেক দেশই এখন একে অন্যের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষমতা ধরে। বাস্তব এই অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেও কি কেউ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনার জন্যে অন্যকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানতে পারে?

গোরবাচেভের 'নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিপদ'-এর বিপরীতে প্রশ্ন ওঠে—এই বিপুল বিশাল অস্ত্রসম্ভার সাম্রাজ্যবাদের কাছেই আজ বুমেরাঙ হয়ে দাঁড়িয়েছে—কাঁড়ি-কাঁড়ি অর্থ আটকে আছে এক বন্ধজলায়, যা মূলধন-বিনিয়োগকে সীমায়িত করছে; বিয়িত হচ্ছে অতি-মুনাফার স্বার্থ। যদিও অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি কিংবা মহাকাশ গবেষণা চাঁদে যাওয়ার ধুম পড়ে যায়। কিন্তু এর পিছনে যে বিপুল লগ্নি তা যদি উদ্দেশ্যই পূর্ণ না করে তবে আর কী লাভ? গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এই অস্ত্রসম্ভারের আজ আর নেই। সুতরাং দাও এই অকেজো অস্ত্র নষ্ট করে। একসময়ে যেমন অতি-উৎপাদিত পণ্য মুনাফার স্বার্থে জাহাজ-বোঝাই করে ফেলে দেওয়া হত সমুদ্রের জলে। আর সেজন্যেই নিরস্ত্রীকরণের ঢক্কানিনাদ—বিশ্বশান্তি-টান্তি বাজে কথা।

বস্তুত গোরবাচেভ পশ্চিমি দুনিয়ার কাছে 'বিকাশের জন্য নিরস্ত্রীকরণ' (Disarmament for development)-এর যে তত্ত্ব ফেরি করেছেন, তার মূল সুর অনেকটাই ওপরের প্রশ্নটিকে যথার্থতা দেয়।

এই প্রসঙ্গে নিউক্লিয়ার-প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রশ্নটিও বিচার্য। শুধুমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রই নয়, পারমাণবিক-প্রযুক্তির তথাকথিত কল্যাণকর প্রয়োগ নিয়েও আজ গোটা বিশ্ব আলোড়িত।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেশে-দেশে যেসব পরমাণু-চুল্লি নির্মিত হয়েছিল, তার উৎপাদনপ্রক্রিয়ার প্রভাবে আজ মানব-সভ্যতা আর-এক সংকটের মুখে। এই চুল্লিগুলোর বর্জ্যসমূহ (nuclear waste) তেজস্ক্রিয়তায় পরিপূর্ণ। সেই বিপজ্জনক আবর্জনা কীভাবে নষ্ট করলে যেহাই পাওয়া যায়, তা এখনও ঠিক-ঠিক জানা যায় নি। সবদেশেই এই আবর্জনা আপাতত মাটির নীচে চাপা দিয়ে পাহারা বসানো হয়েছে। এর আবর্জনা ওর রাজ্যে চাপা দেওয়া নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বেধেছে। সম্প্রতি ওই দেশের থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড এবং সোভিয়েতে চেরনোবিলের দুর্ঘটনা পারমাণবিক চুল্লির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করে তুলেছে। চেরনোবিল দুর্ঘটনা মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি, সেই সোভিয়েত বিজ্ঞানী লেগাসভ অন্তিম শয্যায় রুশ সাহিত্যিক আদামোভিচকে জানিয়েছেন—সোভিয়েতে আরও চেরনোবিল হতে পারে। কারণ, আরও চোদ্দটা চুল্লি আছে চেরনোবিলের নকশায়। আর বাস্তবে এই চুল্লিগুলোর নির্মাণকাজের ত্রুটির জন্য দুর্ঘটনা এড়ানোর কোনো নিরাপদ ব্যবস্থা সত্যি-সত্যিই নেই। এসবের ফলে এবং তীব্র জনরোষে অস্ট্রিয়ায় নির্মিত হয়েছে পারমাণবিক চুল্লি; ৮৬-র পর আমেরিকা নতুন কোনো চুল্লি তৈরি করে নি; ইওরোপ জুড়ে বন্ধাক ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে পরমাণু-গবেষণায়। তাই বলা যায়, আমেরিকা এবং পশ্চিম ইওরোপে আজ পারমাণবিক-প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেই এসেছে ভাটার টান। যে সময়ে পারমাণবিক-প্রযুক্তিরই এই দৈন্যদশা, সেই সময়ে 'নিউক্লিয়ার যুদ্ধাতঙ্ক' কি বাস্তব অবস্থার সঠিক প্রতিফলন ঘটায়?

নিউক্লিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে সবশেষে যে কথাটা আসে তা হল—একটা 'বিশেষ প্রযুক্তি'র (নিউক্লিয়ার অস্ত্র) বিকাশ কীভাবে গোটা সমাজের খোল-নলচে আমূল পালটে দিতে পারে! সমাজবিকাশের স্বাভাবিক উপাদানগুলোকে একেবারে 'নতুন চোখে' পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে? এবং অনেক 'পুরনো' ধারণাকেই বাতিল করে দিতে হয়?

সমাজবিকাশের ধারায় প্রযুক্তি এবং সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস থেকে উদ্ভূত সংগ্রামের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কী? প্রযুক্তি, না শ্রেণীসংগ্রাম—কোন্‌টি সমাজবিকাশের চালিকা শক্তিরূপে নির্ধারক উপাদান?

গোরবাচেভ এসব প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কিন্তু তাঁর উক্তি যেন অতীতের প্রতিধ্বনি। প্রযুক্তিকে প্রধান করে দেখার ফলে মূলধনী ব্যবস্থার প্রথম যুগে কারখানা ধ্বংস করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। গান্ধী শিল্পবিকাশের বিরোধী ছিলেন। আর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা কাউৎস্কি প্রলেতারিয়েতকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন সংগ্রামে যেহেতু বিরোধী পক্ষ অস্ত্র-প্রযুক্তিতে অনেক বেশি শক্তিশালী। মানুষ-সৃষ্ট প্রযুক্তিকে মানুষের থেকে বড়ো করে দেখা, তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দানব বানানো বস্তুবাদী মূল্যায়নে মানুষের যে ভূমিকা তাকে নস্যাৎ করে। সামাজিক বিকাশে শ্রেণীসংগ্রামই যে বিকাশের নির্ধারক উপাদান, এ-ধারণাকে খারিজ করে। এক কথায়, ইতিহাসও যে একটা বিজ্ঞান—তার বিকাশের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে—এই বস্তুবাদী মার্কসীয় তত্ত্বকে পরিত্যাগ করে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় 'নিউক্লিয়ার যুদ্ধাতঙ্ক'র বাস্তব ভিত যথেষ্ট দৃঢ় তো নয়ই, বরং বেশ খানিকটা অমূলকই। অথচ এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে গোরবাচেভ ক্লাউজেভিৎসের 'যুদ্ধ রাজনীতির ধারাবাহিকতা অন্য উপায়ে (হিংসাত্মক)' এই মূল্যায়নকে 'সেকেলে' বলেছেন। যে কথা তিনি বলেন নি তা হল, প্রথম মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ-সময়ে লেনিন এই মূল্যায়নকে সঠিক বলেই পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যুদ্ধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে, এবং দেশে-দেশে বিপ্লবগুলোই শান্তির গ্যারান্টি হবে। এই মূল্যায়ন এমন-কী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেও অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বেও নিউক্লিয়ার জুজুর মিছে ভয় থেকে রেহাই পেলে দেখা যাবে—হয় যুদ্ধ বিপ্লব আনবে, নচেৎ বিপ্লব যুদ্ধ প্রতিহত করবে—এই ধারণা এখনও বাস্তবসম্মত।

নতুন দুনিয়ায় শান্তি

নতুন দুনিয়াতে 'আর যুদ্ধ নয়' এই নতুন আহ্বানে অবশেষে গোরবাচেভ শামিল হতে বলেছেন ব্যবস্থা-নিরপেক্ষ সব ধরনের রাষ্ট্রনেতাদের। কারণ, তাঁর মতে, আজ শ্রেণী-ঊর্ধ্ব মানবতার ভিত্তিতেই নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং তিনি জানেন, 'পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে যৌথ-ভাবেই আমাদের নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে।'[৩]

কিন্তু এটা কি সম্ভব? গোরবাচেভের মতে, অবশ্যই সম্ভব। কারণ—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ কখনই আর সেই চরম রূপ নেবে না যা কিনা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মৌল কারণ। বরং আজ তারা 'শান্তিপূর্ণ' পথে দুনিয়াটাকে নতুন ভাবে ভাগাভাগি করছে; নিজেদের মধ্যে মেতেছে প্রযুক্তি-প্রতিযোগিতায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত এবং সাংগঠনিক পরিকাঠামোর (infrastructure) পরিবর্তন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করছে, এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসছে।

এই সূত্রায়ণে দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে প্রধান দ্বন্দ্বসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার একটি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আন্তঃস্তরীণ দ্বন্দ্বকে খারিজ করা হল।

এরপর সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বকেও একেবারে নতুন চেহারা দিলেন গোরবাচেভ। তাঁর কথায়, সমাজতান্ত্রিক এবং মূলধনচালিত দেশগুলোর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সম্ভব। অতীতে ক্ল্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এ কথা প্রমাণিত হয়েছিল। আর এখন নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে এটা তো খুবই দরকারি। এরপর তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন—মূলধন-আশ্রিত অর্থনীতি কি সামরিকীকরণ না করে টিকতে পারে?—তাঁর মতে, পারে। জাপান তার একটি উদাহরণ। এবং এখানেই তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন 'বিকাশের জন্য নিরস্ত্রীকরণ'-এর বাস্তব সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ অসুযায়ী, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে যদিও অবস্থা একটু ভিন্ন—পাহাড়প্রমাণ বৈদেশিক ঋণ এবং নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ দেশগুলোতে একটা বিস্ফোরক অবস্থা তৈরি করেছে, তবুও এসব দেশেও বৈষয়িক উন্নতির প্রতি নজর না দিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কোনো উপায় নেই।

সুতরাং আজ গোরবাচেভের মতে মূলধনশাসিত দুনিয়ার

সঙ্গে একযোগে অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক কাজ করা দরকার। বিশ্ব-অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো দরকার, যেখানে সমাজতান্ত্রিক, মূলধনী এবং অনুন্নত দেশগুলোর সবার স্বার্থ রক্ষায় ভারসাম্য থাকে। তবেই 'নিরাপদ পৃথিবী' গড়ে তোলা সম্ভব—সম্ভব সম্পদশালী পৃথিবীর বাস্তব রূপ দেওয়া।

এখন তাঁর এই নতুন ফরমুলা যে বাস্তবে শ্রেণী-আপস, তা বোধ করি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার নেই। শুধু আপস করেই গোরবাচেভ থেমে থাকেন নি। তিনি বলেছেন—সে দেশ যেমন খুশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে পারে। সমাজতন্ত্র কিংবা ধনতন্ত্রের ভালোমন্দ ভবিষ্যতে দেশে-দেশে জনগণ ঠিক করবে। আমরা কোথাও সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য সচেষ্ট হব না। সবশেষে এই যৌথ কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে মূলধনশাসিত দেশগুলোর যাতে কোনোরকম সংশয় না থাকে, তাই গোরবাচেভ তাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন—তৃতীয় বিশ্বে কোনোরকম বিস্ফোরণ যাতে না ঘটে, তা পর্যবেক্ষণ করার যৌথ দায়িত্ব তাঁরা নেবেন। আর—

'আমি বারবার ব্যাখ্যা করে বলেছি পশ্চিমি-স্বার্থের প্রতি আমাদের আদৌ বিরূপ মনোভাব নেই। আমরা জানি, আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে কাঁচামালের যোগানক্ষেত্র রূপে মধ্যপূর্ব এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, তৃতীয় বিশ্বের অঞ্চলগুলো এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই সংযোগ ছিন্ন করতে আমরা কোনো-মতেই চাই না। ঐতিহাসিকভাবে গঠিত এই পারস্পরিক আর্থিক-বন্ধনের স্বার্থতে ভাঙন ধরাতে উশকানি দেওয়ার কিছুমাত্র অভিপ্রায় আমাদের নেই।'[৪]

এই একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে গোরবাচেভের সামগ্রিক বৈদেশিক নীতির প্রতিফলন খুব সুন্দরভাবে ঘটেছে। কী চাইছেন গোরবাচেভ আসলে?

এতদিন সোভিয়েতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত হত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এবং ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু-কিছু দেশের সাথে। মিশর কিংবা ইরাকে যে বাণিজ্য-সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল তা এখন ক্ষীণ। সুতরাং দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করতে গেলে বিদেশের বাজার আজ গোরবাচেভদের বিশেষ প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মেটাতে তাঁরা যতদূর প্রয়োজন যেতে প্রস্তুত। সে প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই গোরবাচেভ আপসমূলক 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা' মধ্যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী স্বার্থের (সাম্রাজ্য-বাদ-সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ-তৃতীয় বিশ্ব, পুঁজিপতি-শ্রমিক, ভূস্বামী-কৃষক) ভারসাম্য রক্ষার সূত্র খুঁজে পান। বার্ষে-গোভতে একঘাটে জল খাওয়ানোর গোরবাচেভের এই নতুন দাওয়াই আসলে শ্রেণী-আপসের আরও খোলাখুলি প্রয়াস।

গোরবাচেভের এই 'নতুন চিন্তা'র মধ্যে নতুন তেমন কিছুই নেই। এর মূলকথা বহু আগে ১৯৫৬-তে বলে গেছেন গোরবাচেভের পূর্বসূরী নিকিতা ক্রুশ্চভ। তবে গোরবাচেভ আরও অনেক খোলাখুলি, আরও স্পষ্ট।

বাস্তবে, গোরবাচেভের বিদেশ-নীতি বিশ্ব-পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বস্তুবাদী চিন্তা অনুসরণ করছে না। খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস-নীতি নিয়েছে। দেশে-দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নিরুৎসাহিত করছে। অর্থাৎ পৃথিবীটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই যেন থাকে, আর এক পা-ও না এগোয়—এই গোরবাচেভের মনোগত বাসনা।

যে গোরবাচেভ স্বদেশের অর্থনীতির অচলাবস্থাকে দূর করতে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রস্তাব করেন পেরেসত্রোইকা (এক নতুন বিপ্লব); সেই তিনিই আবার বহির্বিশ্বকে অচল করে রাখতে চান তাঁর দেশের অর্থনীতিরই স্বার্থে—এই বৈপরীত্য চোখে লাগে না কি।

অনিন্দ্য সেন
কলকাতা

সূত্রনির্দেশ :

১. October and Perestroika : The Revolution Continues – Novosty Press Agency, p 59.
২. Ibid
৩. Ibid, p 64
৪. Perestroika, Mikhail Gorbachev, Fontana p 178

[অনুবাদ লেখকের। যেসব অনুচ্ছেদে গোরবাচেভের মতামতের সারকথা দেওয়া সেগুলো সবই 'October and Perestroika The Revolution Continues' এবং 'Perestroika'—বই দুটি থেকে সংগৃহীত। ঋণ স্বীকার—পথিক গুহ, রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে (১ জানুয়ারি, ৮৯) তাঁর 'ড্রাগনের লেজ নিয়ে খেলা' এবং 'স্বার্থপরতা আর গোপনীয়তার আড়ালে' রচনা দুটির জন্য]

২

নভেম্বর মাসের "চতুরঙ্গ"-তে গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে খাজিম আহ্‌মেদ "জিন্না : পাকিস্তান—নতুন ভাবনা"—এই নামের শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত বইখানির বিস্তারিত এবং সুন্দর একটি আলোচনার এক জায়গায় (পৃ ৬৪৩) বলেছেন যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রায় **'গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম'**-এর মতো মানসিকতার দ্বারা চালিত হয়ে ক্ষমতা-হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি 'অশোভনভাবে ত্বরান্বিত করেন'। অবশ্যই আহ্‌মেদ সাহেব **গেলাম**, দেখলাম, জয় করলাম' এই তিনটি কথাতে জুলিয়াস সীজারের বিখ্যাত **'Veni**, vidi, vici'—এই তিনটি লাতিন শব্দের অনুবাদ দিতে চেয়েছেন। এতে সামান্য একটু অসঙ্গতি ঘটেছে। ঐ লাতিন তিনটি শব্দের প্রথমটি অর্থাৎ 'veni' (উচ্চারণ 'ভেনি', অসতর্কভাবে 'ভিনি' বলা হয়ে থাকে) শব্দটি এসেছে লাতিন ক্রিয়াপদ venire (ভেনিরে) থেকে, যার অর্থ 'আসা' (to come), 'যাওয়া' (to go) নয়। সুতরাং আহ্‌মেদ সাহেবের **'গেলাম**, দেখলাম, জয় করলাম' হবে **'এলাম**, ইত্যাদি'। জুলিয়াস সীজার তাঁর প্রতিপক্ষ Pharnaces কে সহজেই পরাজিত করে **ঘটনাস্থল থেকেই Roman Senate-এ খবরটি এভাবে পাঠান—Veni** (এলাম), Vidi (দেখলাম), Vici (জয় করলাম)।

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যানী, নদীয়া

নাটক

বিবিধের মাঝে মিলন

পঞ্চম জাতীয় নাট্যমেলা

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রথম অংশ গত সংখ্যায় প্রকাশিত]

৩. মারাঠি নাট্য : পরীক্ষামূলক ও পেশাদারি

"ঘাসিরাম কোতওয়াল", "কন্যাদান", "ডাকঘর", "ওয়াড়া চিরেবন্দী" ইত্যাদি প্রযোজনা দেখার পর মারাঠি থিয়েটার সম্বন্ধে বাঙলার দর্শকের একটা প্রত্যাশা জন্মেছে। নাট্যমেলার দ্বিতীয় দিন (৪ঠা ডিসেম্বর) সকালে বম্বের "রূপভেদ"-এর প্রযোজনা "আত্মকথা"-য় তা পূর্ণ হলেও ওই একই সন্ধ্যায় বম্বেরই দল "রঙ্গ-যাত্রী"-র "অগ্নিপথ" দেখে তা হতাশায় পর্যবসিত হল। পাশাপাশি "আত্মকথা" এবং "অগ্নিপথ"-এর অভিজ্ঞতা মারাঠি পরীক্ষামূলক এবং পেশাদারি থিয়েটারের মূল পার্থক্যগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে। একদিকে আধুনিক জীবনের জটিল স্তরগুলিকে বোঝার আন্তরিক প্রয়াস, বুদ্ধিমান আর সংবেদনশীল প্রযোজনাশৈলী, সংযমী অথচ মরমি অভিনয় ; অন্যদিকে সামাজিক সমস্যার সরলীকৃত রূপায়ণ, নিম্নরুচির অতিনাটকীয় উপস্থাপনা, উঁচু বাহ্যিক চরিত্রায়ণ। আশ্চর্য এই যে, সকালের প্রযোজনায় যে প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী অমন উচ্চমানের অভিনয় করলেন, সন্ধ্যার মঞ্চায়নে তাঁরাই কখনো মাত্রাধিক্যে, কখনো 'টাইপ'-অভিনয়ে দর্শককে দূরে সরিয়ে রাখলেন। এটাকে তাঁদের কৃতিত্ব বলেই মানতে হবে ; কারণ, একই সঙ্গে দুই থিয়েটারের দাবি তাঁরা মিটিয়ে চলছেন। একই ধরনের অনায়াস বিচরণ আধুনিক ভারতীয় সিনেমাতেও দেখা যাচ্ছে—আর্ট ফিলম আর কমারশিয়াল ফিলমের জগতে।

মারাঠি থিয়েটারের সঙ্গে বাঙলা থিয়েটারের একটা বড়ো ফারাক—প্রথমটিতে নাট্যকারের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে পরিচালকের। আধুনিক মারাঠি নাট্যকারদের মধ্যে মহেশ এলকুঞ্চওয়ার একটি উজ্জ্বল নাম। কলকাতার দর্শক "ওয়াড়া চিরেবন্দী"-র মাধ্যমেই তাঁকে চিনেছিলেন, কিন্তু সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল "আত্মকথা"য়। এ নাটকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসটি দ্বিস্তর। প্রাথমিক স্তরের কেন্দ্র মানবিক সম্পর্ক, দ্বিতীয় স্তরে জীবন আর শিল্পের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। সত্তরোর্ধ্ব প্রতিষ্ঠিত লেখক রাজাধ্যক্ষের জীবন আর কর্ম বিষয়ে গবেষণা করছে তরুণী প্রদ্‌না (প্রড়না ? প্রজ্ঞা ?)। গবেষণার একটি অংশ রাজাধ্যক্ষের আত্মকথা লিপিবদ্ধ করা। প্রায় দুই প্রজন্মের দূরত্ব থেকে প্রদ্‌না এই প্রবীণ লেখকের জীবনের ভাঁজগুলো খুলে দেখতে চায়। আর তখনই উদ্‌ঘাটিত হয় রাজাধ্যক্ষের জীবনের কেন্দ্রীয় দুই নারীর সঙ্গে সম্পর্কগঠনে তাঁর ব্যর্থতা। স্ত্রী উত্তরা আর প্রেমিকা শ্যালিকা বাসন্তী দুজনেই রাজাধ্যক্ষকে ছেড়ে চলে গেছে। একজন গেছে অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, অন্যজন রাজাধ্যক্ষেরই প্রতিদ্বন্দ্বী এক লেখককে ভালোবেসে। বাসন্তীর দ্বিতীয় প্রেমিক দেবদত্ত মৃত, কালের বিচারে সে এখন মহান লেখক। নিজের জীবনের এই যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা রাজাধ্যক্ষ ইতিপূর্বেই লিখেছেন এক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে, যে উপন্যাসে উত্তরা উর্মিলা, বাসন্তী বসুধা আর দেবদত্ত চারুদত্তে পরিণত। প্রদ্‌নার কাছে নিজের কথা বলতে-বলতে রাজাধ্যক্ষ বুঝতে পারেন মানুষ হিসেবে অপর মানুষের প্রতি দায়িত্বে তিনি যেমন ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ শিল্পী হিসেবে জীবনের সত্য রূপায়ণে। কুড়ি বছর আগে লেখা আত্মজীবনীনির্ভর উপন্যাসে মূল মানুষগুলো তাঁরই অবচেতন কল্পনায় রূপান্তরিত। নিজের শিল্প এবং জীবন সংক্রান্ত এইসব সমস্যা নিয়ে তিনি যখন বিভ্রান্ত, তখনই তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর প্রতি যুবতী প্রদ্‌নার দুর্বলতা। প্রদ্‌না যুবক প্রমোদের বাগ্‌দত্তা প্রেমিকা—অন্তত রাজাধ্যক্ষ

তাই জানতেন। এই আকস্মিক আবিষ্কারে রাজাধ্যক্ষ প্রচণ্ড আঘাত পান। প্রদ্‌নাকে ফিরে যেতে বলেন প্রমোদের কাছে। খোলা জানালার সামনে, তারাভরা অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রদ্‌নাকে তিনি বলেন—ওই গ্রহতারকাগুলি যেমন পরস্পর থেকে হাজার-হাজার আলোকবর্ষ দূরে স্থিত, মানুষও তেমনি পরস্পর থেকে ঠিক ততটাই দূরে অবস্থিত। তাই মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙতে নেই, গড়ে তুলতে হয়। প্রকৃত আত্মকথা লেখা যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, রাজাধ্যক্ষ তা ইতিপূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। এখন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রদ্‌না বিদায় নেবার পর তিনি স্ত্রী উত্তরাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। ওদিকে উত্তরাও তখন তাঁকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের তিনজনের অন্ধকার দ্বন্দ্বচ্ছিন্ন জীবনে একটিমাত্র আনন্দের বার্তা জানাতে—যে বার্তা তিনিও এইমাত্র জেনেছেন—বাসন্তীর গর্ভের সন্তান দেবদত্তের নয়, রাজাধ্যক্ষের। যোগাযোগ হয় না, হতাশ ক্লান্ত রাজাধ্যক্ষ যখন নিজের চেয়ারে নিদ্রাচ্ছন্ন (হয়তো মৃত্যুর ব্যঞ্জনাও আছে সেই গভীর নিদ্রায়) তখন উত্তরার সুসংবাদ বহন করে ফোন বেজেই চলে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধানে কোনো সংযোগের সেতু তৈরি হয় না।

শ্যাম ভূতকারের মঞ্চসজ্জায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। মঞ্চের দুই ধারে দুটি ভিন্ন বাসস্থানের আভাস—ডানদিকে রাজাধ্যক্ষের পড়ার ঘর, বাঁদিকে উত্তরার বসার ঘর। মাঝখানে শূন্য অনালোকিত অংশটি যেন সেই হাজার হাজার আলোকবর্ষের দ্যোতক, যা একজন মানুষকে আরেকজনের থেকে দূরে রাখে। এই মাঝের অংশটির একেবারে সামনে একটি অনতি-উচ্চ গোল চবুতরা। এখানেই ফ্লাশব্যাকের চিরপরিচিত অথচ প্রয়োগের গুণে অভিনব উপস্থাপনা দেখা যায়, আবার অতীতের বাস্তবের পাশে উপস্থিত হয় শিল্পের কল্পিত বাস্তব। এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক পরিবেশনে শিল্প এবং জীবনের সম্বন্ধের জটিলতা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মানবিক সম্পর্কের গভীর সংকটগুলিও তেমনি পরিস্ফুট হয়। আলোর ব্যবহারে কুমার সোহনী তিনটি পরিষ্কার বিভাজন করেছেন—তিনটি আলাদা রঙে তিনি বর্তমান, অতীত আর কল্পনার স্তরকে ধরেছেন। প্রযোজনাটিতে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত, শুধু নাটকের একেবারে শেষে যবনিকাপতনের মুহূর্তে টেলিফোনের বেজে-চলা আওয়াজ ছাপিয়ে বেজে ওঠে একটি মর্মভেদী সুর।

এ প্রযোজনার সবচেয়ে প্রশংসনীয় অংশ অভিনয়। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এত সাবলীল সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন যে সত্যিই ভ্রম হয় যে ঘটনাগুলি এই প্রথম দর্শকের চোখের সামনে ঘটে চলেছে। অভিনয়ের গুণে অসাধারণ কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টি হয় প্রযোজনায়—দুই বোন, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘাতে, কিংবা যখন উপন্যাসের উর্মিলা আর বসুধা লেখকের কল্পনায় এসে উপস্থিত হয়—লেখক তাদের বাস্তবের উত্তরা ও বাসন্তী বলে ভুল করেন, কিন্তু তারা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দাবি করে (এই অংশটি প্রায় পিরান্দেলীয় বাস্তবজিজ্ঞাসার স্তরে উন্নীত হয়) অথবা যেখানে প্রদ্‌না আবেগপূর্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে লেখককে আর সাপের ছোবল খাওয়ার মতো চমকে সরে যান রাজাধ্যক্ষ। তীব্র আবেগের সঙ্গে প্রবল সংযমের ব্যবহারে উত্তরার ভূমিকায় জ্যোতি সুভাষচন্দ্র অনবদ্য, রাজাধ্যক্ষরূপী শ্রীরাম লাগু সহজাত সাবলীলতায়, অভিব্যক্তি ও কণ্ঠের সার্থক ব্যবহারে কখনো তিরিশ বছর আগের মধ্যবয়স্ক লেখক, কখনো বর্তমানের প্রবীণ মানুষটি। সুহাস যোশীর অভিনয় বুদ্ধিদীপ্ত নিশ্চয়, কিন্তু তাঁকে যেন আরও ভালো লেগেছিল "কন্যাদান"-এ। প্রযোজনার কনিষ্ঠতমা শিল্পী শুভাঙ্গী সাঙওয়াই অনুভূতিপ্রবণ অথচ স্বাভাবিক অভিনয় উজ্জ্বল। প্রযোজনার প্রতিটি স্তরেই নির্দেশিকা প্রতিমা কুলকানি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সব অর্থে "আত্মকথা" একটি সার্থক নাট্যপ্রযোজনা, যা "ওয়াড়া চিরেবন্দী"-র মতো বহুদিন কলকাতার দর্শকের স্মৃতিকে ভরিয়ে রাখবে।

এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বিরতিহীন সংহত "আত্মকথা"র পর দু-ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের গড়িয়ে-চলা "অগ্নিপথ" দেখতে বেশ ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। প্রভাকর মায়করের নাটকটির উপজীব্য সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের আধুনিক মূল্যবোধের সংঘাত। বিষয়বস্তু অত্যন্ত সরলীকৃত এবং একমাত্রিক হলেও, কাহিনীটি জটিল এবং কখনো একঘেয়ে। নাটকের কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য এবং অহঙ্কারের প্রতীক বাঈসাহেব, যিনি নিজের চিতপাবন বংশের উত্তরাধিকারকে মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেন না।

দুর্বলচরিত্র মদ্যপ স্বামী ও শহরে কলেজে-পড়া শিক্ষিত ছেলেমেয়ের ওপর তাঁর একাধিপত্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঘাত আসে নতুন প্রজন্মের তরফ থেকেই, মেয়ে প্রেমে পড়ে তাদেরই পরিচারকের পৌত্রের সঙ্গে, আর ছেলে লুকিয়ে বিয়ে করে আনে কায়স্থ মেয়েকে। পুত্রবধূ সুনীতাই আচারবিরুদ্ধ আধুনিক ব্যবহারে শাশুড়ির ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। অসাধারণ কূটবুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের সাহায্যে বাঈসাহেব একই সঙ্গে ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর আভিজাত্য আর অহঙ্কারের দুর্গ টিকিয়ে রাখেন। কিন্তু ইতিহাস এবং সময়ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে—পুনের ব্রাহ্মণের হাতে গান্ধিজী খুন হওয়াতে যে দাঙ্গা লাগে, তার থেকে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণ পরিবারের মতো বাঈসাহেবের পরিবারও রক্ষা পায় না। পরের প্রজন্মটি শহরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। চারপাশের ছড়িয়ে-পড়া আগুন যখন রাওসাহেব ও বাঈসাহেবের প্রাসাদ স্পর্শ করে, তখন অগ্নিপঙ্খ পাখির মতো বাঈসাহেব স্বামী-সহ সেই আগুনে আত্মাহুতি দেন। প্রযোজনার শুরুতে মনে হয়েছিল নাটকটি বুঝি জাতিভেদ-বিরোধী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের প্রতিনিধি বাঈসাহেবকে যেন ট্র্যাজিক নায়িকার পর্যায়ে উন্নীত করে। আসলে পুরো নাটকটাই একদিকে যেমন জাতিভেদসমস্যার সরলীকৃত রূপায়ণ, অন্যদিকে তেমনি বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

প্রযোজনার কোনো অংশেই কোনো গভীরতা নেই। বরং দু-এক জায়গায় দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য হাস্যরসের উপাদান রাখা হয়েছে। বাঈসাহেব যে রাওসাহেবের ওপর কর্তৃত্ব করেন—এই অবস্থাটিকে নিংড়ে কোথাও-কোথাও হাসি বার করবার প্রয়াস আছে। অন্যত্র পরিচারক রঘুকে কেন্দ্র করেও হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। ভি. জি. গড়সের মঞ্চসজ্জা অহেতুক আড়ম্বরে পূর্ণ। তাতে নেই কোনো কল্পনা বা বুদ্ধির স্পর্শ, শুধু আছে অতি-অলঙ্করণের প্রবণতা। এ ছাড়া মঞ্চপরিকল্পনার মধ্যে একটা গতানুগতিকতার ছাপ আছে। তবে ওরই মধ্যে বাঈসাহেবের চেয়ার ও পাশের প্রতীকী থামদুটি সামান্য দ্যোতনা আনে। ওইদিন সন্ধ্যায় আলো নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছে। শুরুতেই মঞ্চের পেছনের একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় সাইক্লোরামাটি সারা নাটকে আর ব্যবহার করা যায় নি। কিন্তু বাধাবিপত্তি বাদ দিয়েও, আলোকপরিকল্পনা অত্যন্ত সাধারণ। নাটকের শেষে মঞ্চের নানা স্থানে ম্যাগনেশিয়াম ও সালফারের সাহায্যে ধোঁয়া আর আগুনের বিভ্রম সৃষ্টি করা শুধুমাত্র কল্পনাশক্তির দারিদ্র্যকেই প্রকাশ করে। এই প্রযোজনায় সঙ্গীতের বেশ ব্যাপক ব্যবহার আছে। নাটকের শুরুতে আর শেষে, যবনিকার উত্থান আর পতনের সঙ্গে সঙ্গে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার মাঝে, এমনকী ঘটনার বা সংলাপের গুরুত্ব কিংবা আবেগময়তা বোঝাতেও সঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সুখের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেতার বা সরোদ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। সঙ্গীত প্রধানত রাগাশ্রিত। পোশাকে ঝকঝকে রঙ ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিচালক হিসেবে কুমার সোহনীর ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট অভিনেতাদের ক্ষেত্রে। রাওসাহেবের ভূমিকায় শ্রীরাম লাগুর অভিনয় অতিকৃত, যদিও এই চরিত্রের দুর্বলতা, স্বাভাবিক কোমলতা চিত্রনে তিনি সার্থক। বাঈসাহেবের চরিত্রে সুহাস যোশীর অভিনয় বড়ো একমাত্রিক, ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রকাশ থাকলেও, বয়সের ছাপ চরিত্রায়ণে অনুপস্থিত। অন্যান্য ভূমিকাভিনেতাদের মধ্যে ভৃত্য রঘুর ভূমিকায় বাজিরাও গোফলকার ও ম্যানেজারের ভূমিকায় মধুকর নাইকের নাম শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে।

অভিনয়ের মান থেকে প্রমাণিত হল যে এইসব পেশাদারি দলগুলিতে দু-একজন শিল্পীর বক্স অফিসের ওপর নির্ভর করে বাকিদের কাজ-চালানো গোছের অভিনয় করিয়ে নিলেই চলে। "ওয়াড়া চিরেবন্দী"-ও যতদূর জানি, মারাঠি পেশাদার মঞ্চেরই নাটক। অথচ শুধুমাত্র পরিচালকভেদে কতটা তফাত হতে পারে "অগ্নিপঙ্খ" তার প্রমাণ। তবু কোনো অভিজ্ঞতাই ফেলে দেবার নয়—এই বলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে। একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। অভিনয়ের শুরুতে ও বিরতির পরে প্রেক্ষাগৃহের বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি ছাড়াও মঞ্চের ওপর একটি প্রকৃত পেতলের ঘণ্টা বাজানো হচ্ছিল। অভিনয় চলার সময় ঘণ্টাটি সারাক্ষণ কিছু ফুলসহ মঞ্চের সামনে বসানো ছিল। বাস্তবানুসারী প্রযোজনা, মঞ্চ, অভিনয় ইত্যাদি পাশাপাশি প্রাচীন

নাট্যরীতির ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টা আর ফুল দেখে কৌতূহল হচ্ছিল জানতে যে ওটা কি পেশাদারি নাটকের কোনো সংস্কারের সঙ্গে জড়িত?

৪. মূল্যবোধের নাটক

আলোচনার শেষ দুটি নাটকের মধ্যে ভাষাগত, বিষয়গত, আঙ্গিকগত বা প্রযোজনাগত কোনো মিল নেই। তবু এই নাটক দুটির মধ্যে একটি ক্ষীণ সংযোগ আছে। কারণ, দুটি নাটকই সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের নাটক। ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অভিনীত "হত্যা এক আকার কি"-র প্রযোজক দিল্লির "অভিযান" নাট্যসংস্থা, লেখক ললিত সেহগাল ও নির্দেশক রাজিন্দার নাথ, যিনি এই নাট্যমেলায় সম্মানিত নাট্যব্যক্তিত্বদের একজন। নাটকটি "অভিযান" সংস্থার প্রথম প্রযোজনা—১৯৬৭ অর্থাৎ একুশ বছর আগে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

১৯৪৮ সাল। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত চার যুবক। যাত্রারম্ভের মুহূর্তে তাদেরই মধ্যে একজন প্রশ্ন তোলে—এই হত্যা ন্যায়সঙ্গত কি না? তার সংশয় কাটাতে বসে একটি কাল্পনিক বিচারসভা যেখানে সংশয়ান্বিত যুবকটিই গান্ধিজীর প্রতিনিধি। গান্ধিজীর বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, নির্দেশ এবং কাজ নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তোলে প্রতিপক্ষ। গান্ধিজীকে অভিযোগের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যুবক নিজেই যেন গান্ধিজীর সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে যায়, গান্ধিজীর আদর্শের বাণীগুলিই উচ্চারিত হতে থাকে তার কণ্ঠ থেকে। প্রতিপক্ষের সাক্ষী, উকিল, মায় পক্ষপাতদুষ্ট বিচারপতি যখন পারেন না এই আদর্শের সঙ্গে লড়তে, তখন যুবকটিকে হত্যা করে তারা আরও একটি হত্যার চেষ্টায় নির্গত হয়। মৃত যুবকটি কিন্তু মরে না, মরে শুধু তার "আকার" তার কায়িক শরীর; কিন্তু তার চেতনা, তার বিবেক, তার আদর্শ বেঁচে থাকে সমস্ত মানবজাতির বিবেক হয়ে। সমস্ত নাটকীয় অবস্থাটিই কল্পিত। এই বানানো বিচারসভা বসিয়ে নাট্যকার শুধু গান্ধিজীর হত্যার পক্ষ বা বিপক্ষের কারণগুলিই বিশ্লেষণ করেন না, এইজাতীয় "অন্ধ" রাজনৈতিক ঘৃণাকেই নিন্দাবাদ জানান। কুড়ি বছর আগের নাটক; তাই আজকের এই রাজনৈতিক দলাদলি আর ধর্মীয় মৌলবাদের যুগে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারত। হল না যে, তার প্রাথমিক কারণ নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয়ের দুর্বল উপস্থাপনা। সাধারণত নাটক তৈরি হয় সংঘাতের মাধ্যমে। সেই সংঘাতে যদি দুই পক্ষের সমতা না থাকে, যদি তা হয় একপেশে, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি যদি না হয় নৈর্ব্যক্তিক, তবে তা কূটতর্ক বা বক্তৃতা হয়ে উঠতে পারে, নাটক হয় না। গান্ধিজীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয় সেগুলি বাস্তব রাজনৈতিক-সমস্যানির্ভর, অথচ এর উত্তর আসে সম্পূর্ণ বিমূর্ত আদর্শের স্তরে। রাজনীতিতে আদর্শের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাস্তবের দাবি না মানলে তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব হয়ে ওঠে, সাধারণ জীবনে ব্যবহার্য হয় না। নাটকটিতে এমনভাবে গান্ধীজি আর তাঁর কর্মজীবনকে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে মনে হয় তিনি আদর্শবাদী দার্শনিক হিসেবে সার্থক হলেও, রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে ব্যর্থ। আর বাস্তববাদী রাজনীতির পাশে আদর্শের বাণীগুলি মহৎ এবং জোরালো শোনালেও, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। পুরো নাটকটিতে গান্ধিজী আর তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আদর্শায়িত করা হয়েছে, রোমানটিসাইজ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় নি। খ্রীষ্ট ও লিঙ্কনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে মানবস্বার্থের শহীদ বানানো হলেও, তাঁর প্রকৃত মূল্যায়নের কোনো প্রয়াসই করা হয় নি। শুরু থেকেই গান্ধিজীর প্রতি অন্ধ পক্ষপাত নাটকের বক্তব্যকেই শুধু যুক্তিবিরহিত করে তোলে নি, তার নাট্যসত্তাকেও হীনবল করেছে।

প্রযোজনা নাটকটিকে কোনোভাবেই সাহায্য করে নি। নিরাভরণ মঞ্চের মাঝখানে একটি নীচু চবুতরা, বাঁদিকে উইংস বেয়ে উঠে গেছে একটি সিঁড়ি, এ ছাড়া আছে গোটাকয়েক চেয়ার আর একটি টুল। সিঁড়িটা মাটির তলার গোপন কক্ষের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেও, নাট্যক্রিয়ায় অন্য কোনো ভাবে প্রয়োজনীয় নয়। আলোর ব্যবহারে কোনো নতুনত্ব নেই, নেই তেমন কল্পনার স্পর্শও। সঙ্গীতপরিকল্পনা কিন্তু বেশ উন্নত মানের। পরদা খুলতেই পাখওয়াজ-জাতীয় কোনো বাদ্যযন্ত্রে গুম-গুম শব্দ একটা গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে। ওই একই

ধরনের সঙ্গীত ব্যবহার করা হয় কল্পিত বিচার চলার সময়—বিচারের আবেষ্টনী থেকে বর্তমান বাস্তবে সরে আসা এবং ফিরে যাওয়া চিহ্নিত করতে। খটকা লাগে সাউনডট্র্যাকের ব্যবহারে—যে সাউনডট্র্যাকে বিচার-সভায় আগত সাধারণ মানুষের কণ্ঠ ভেসে আসে—অভিনয়ের ধরনে পরিষ্কার হয় যে তাঁরা উপস্থিত দর্শকবৃন্দ—সেই সাউনডট্র্যাকেই কী করে বাজে নাটকের একটিমাত্র গান (গানের ওরমুখী বোল কি সমকালীন কোনো প্রাসঙ্গিকতা বহন করে?) যে গানের করুণ সুরে গান্ধিজীর স্বপ্নের ব্যর্থতার দুঃখ ঝরে পড়ে? তা ছাড়া, দর্শককে যখন বিচারসভার মানুষ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, অভিনেতারা যখন কিছু মন্তব্য তাঁদের দিকেই ছুঁড়ে দিচ্ছেন, তখন নেপথ্যকণ্ঠ ব্যবহার না করে, অন্য কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দর্শকের মধ্যে বসিয়ে রাখলে সমস্ত নাটকীয় অবস্থাটাই আরো জীবন্ত হয়ে উঠত না কি? সেই দিনের প্রযোজনায় টেপরেকর্ডারটি বেশ কয়েকবার বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল।

অভিনয় খুবই সাদামাটা। সত্যি বলতে গেলে, অভিনেতাদের খানিকটা অপ্রস্তুত বলেই মনে হল। মহড়ার অভাব বা অনভ্যাসের ফলেই সংলাপ বলায় বা ধরতাই (cue) লুফে নিতে এমন ভুল হয়। নাটকটির সঙ্গে বিষয়বস্তুতে কামুর "দ্য জাস্ট" ও আঙ্গিকে তেণ্ডুলকরের "জাস্ততা কোর্ট চালু আহে"র সাদৃশ্য আছে। প্রযোজনার ধরনে ষাট দশকের নাট্যভাবনার প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু দুর্বল অভিনয়ের জন্য এটিকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজনার সমমানের বলে মনে হয়। এত জরুরি আর প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের এমন নীচুদরের উপস্থাপনা—নাটক এবং প্রযোজনা, দু ক্ষেত্রেই দেখে দুঃখ হয়।

নাট্যমেলার পঞ্চম দিনে, ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, মঞ্চস্থ হল পশ্চিম বাঙলার সাম্প্রতিক প্রযোজনাগুলির মধ্যে অন্যতম "গান্ধার"-এর "নীলাম নীলাম"। আর্থার মিলার-এর ইংরাজি নাটক "দ্য প্রাইস" অবলম্বনে এই রূপান্তর করেছেন নাটকটির পরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায়। রূপান্তরিত হলেই নাটক সবক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে আত্মীকৃত হয়ে ওঠে না—ওঠে না যে তার ইঙ্গিত আমরা অতীতে বা অনতি-অতীতে কিছু কম পাই নি। "নীলাম নীলাম"-এর ক্ষেত্রেও অপরিচয়জনিত এই দূরত্ব থাকার সম্ভাবনা ছিল। তিরিশ দশকের যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার কথা আর্থার মিলারের মূল নাটকে বারবার তীব্রভাবে উচ্চারিত, সেই অর্থনৈতিক সঙ্কটের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। য়ুরোপের বুকে ঘটে-চলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মার্কিনি অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতীয় অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার কোনো সাযুজ্য নেই। অসিত মুখোপাধ্যায় এই সমস্যাটিকে সামলিয়েছেন প্রযোজনার উৎকর্ষে। তাই যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের প্রকৃত অর্থনৈতিক রেখাচিত্রের সঙ্গে বিজয়নারায়ণ ও সঞ্চয়নারায়ণের বাবার ব্যবসায়িক ব্যর্থতা মিলিয়ে দেখার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে যায়, যেমন নগণ্য হয়ে যায় একমাত্রসন্তানসঙ্গবিচ্ছিন্ন মদ্যপ এস্থারের বদলে পাওয়া চানাচুর-আসক্ত অনীতাকে মেনে নেবার প্রাথমিক অসুবিধেটুকু।

বাতিল-হয়ে-যাওয়া কিছু পুরনো আসবাবপত্রের সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের সূত্রে মুখোমুখি হন বহুদিন সম্পর্কচ্ছিন্ন দুই ভাই—স্বভাবগতভাবে সৎ, নিঃস্বার্থ, দায়িত্ববান, আদর্শবাদী অথচ জীবনযুদ্ধে অসফল পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয়নারায়ণ আর আত্মকেন্দ্রিক, বাস্তববাদী, কর্মতৎপর, সাফল্যের চূড়ায় অবস্থিত ডাক্তার সঞ্চয়নারায়ণ। যে বাড়িতে তাঁদের দেখা হয়, যে বাড়িটি দু-এক দিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মিউনিসিপাল করপোরেশনের বুলডোজারের তলায়, তা তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি। আর সে বাড়ির ওইসব প্রাচীন আসবাব তাঁদের উত্তরাধিকার। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণের প্রসঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয় দুজনের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিরোধী দুই দৃষ্টিভঙ্গি। কথায়-কথায় আলাদা দুই মূল্যবোধে, দুই জীবনবীক্ষায় সংঘর্ষ বাধে। উদ্‌ঘাটিত হয় এক কঠিন সত্য—জীবনযুদ্ধে পরাজিত যে বাবাকে সাহায্য করতে গিয়ে বিজয়নারায়ণ জীবনের সবচেয়ে ভালো সুযোগগুলি নষ্ট করেছেন, যে অসহায় বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে সঞ্চয়নারায়ণকে তিনি দায়ী করেন, সেই বাবাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রবঞ্চনা করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন অনেকটা তাঁর ছোটো ছেলেরই মতো—চতুর, স্বার্থপর, সুযোগ-

সন্ধানী। কিন্তু এই সমাজে টিকে থাকতে হলে এই ধরনের মূল্যবোধই বোধ হয় বেশি প্রয়োজন। বিজয়নারায়ণ আর সঞ্চয়নারায়ণের সংঘর্ষের পশ্চাৎপটে আছে আরও একটি মানুষ—পুরনো আসবাব-ক্রেতা শৈলমোহন সুর। পুরনো আসবাবের মতো পুরনো মূল্যবোধের বিনিময়মূল্য যে আধুনিক সমাজে সামান্যই, তা সে জানে। বিজয়নারায়ণকে সেকথা সে বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোথায় যেন তার নিজের প্রাচীনত্ব মিলে যায় বাতিল আসবাবগুলির প্রাচীনত্বে, তার বাতিল-হওয়া অস্তিত্ব এক হয়ে যায় বিজয়নারায়ণের বাতিল-হয়ে-যাওয়া মূল্যবোধগুলির সঙ্গে। তাই নাটকের অন্তিম মুহূর্তে, সস্তায় বিকিয়ে যাওয়া একঘর পুরনো আসবাব নিয়ে সে যখন হাসতে থাকে, তখন তার দুচোখের কোণ অশ্রুসিক্ত। এ নাটকের চতুর্থ চরিত্র অনীতা, বিজয়নারায়ণের স্ত্রী। মূল নাটকের থেকে রূপান্তরে তাঁর ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। বিজয়নারায়ণ আর সঞ্চয়নারায়ণের বৈপরীত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে স্বামীর ভালোমানুষিকে ধিক্কার দিলেও নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন, সামাজিক ব্যর্থতার মধ্যেও নিজের বিবেকের কাছে মাথা তুলে বাঁচতে পারে মানুষ।

সত্তর দশকের পটভূমিতে লেখা রূপান্তরটি এই দশকে যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। নাটকের অন্তর্নিহিত শক্তি সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধগুলির নৈর্ব্যক্তিক রূপায়ণে। বিজয় বা সঞ্চয় কারোর দৃষ্টিভঙ্গিই অস্বীকার করার মতো নয়। "হত্যা এক আকার কি"-র সঙ্গে এ নাটকের প্রাথমিক তফাত এইখানেই, নাট্যকার কোনো পক্ষই অবলম্বন করেন নি। দুই দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিই সমশক্তির। নাটক দেখতে-দেখতে কে ভুল, কে ঠিক নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য সেটা প্রাথমিক। মূল্যবোধ-সংক্রান্ত যে জরুরি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় দর্শককে, তার একটা নিজস্ব উত্তর নির্ধারণ করতেই হয় তাঁকে। যদিও হয়তো বিজয় আর সঞ্চয়ের যুগপৎ সহাবস্থান তাঁর নিজের মধ্যেই।

প্রযোজনায় আয়োজন সামান্য। সাদামাটা, বিবর্ণ-হলদেটে রঙের ফ্ল্যাট সাজিয়ে করা পুরনো বাড়ির সেট, ইতস্তত ছড়ানো ভাড়া-করা পুরনো আমলের আসবাবপত্র—এইটুকুই শুধু মঞ্চসজ্জা। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার একটি দরজা বাঁদিকের দেওয়ালে। এ ছাড়া, ডানদিকে পেছনে অন্য আরেকটি ঘরে যাবার দরজা, যে দরজা দিয়ে ও-ঘরে জমানো কিছু পুরনো আসবাব চোখে পড়ে। দরজার পাশে পেছনের দেওয়ালের জানালার কাঁচের শার্সি-গুলোতে যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার চিহ্ন হিসেবে কোনাকুনি কাগজ আঁটা। আলোকপরিকল্পনা নাটকের এই বাইরের অনাড়ম্বর চেহারার সঙ্গে সুসমঞ্জস। অথচ দু-এক জায়গায় তা প্রযোজনায় একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজন করে। আবহে সঙ্গীত বা ধ্বনির কোনো ব্যবহার নেই এ নাটকে। মঞ্চের ওপর একটি গ্রামোফোনে পুরনো একটি রেকর্ড দুবার বাজিয়ে শোনেন দুটি ভিন্ন চরিত্র।

বাঙলা থিয়েটারে অভিনয়কে বাদ দিয়ে চলার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল বেশ কিছুকাল ধরে। সুবিধেও ছিল—ব্রেশ্‌টের ধুয়ো তুলে নাচগানে আসর মাতিয়ে তোলা যাচ্ছিল। তারপর একসময় ধীরে-ধীরে বাঙলা থিয়েটার যেন সচেতন হল—বেছে নিল এমন কিছু নাটক যাতে আছে জীবনের জটিল প্রশ্নের উত্থাপন আর বিশ্লেষণ, যে জটিলতাকে রূপায়িত করার জন্য থিয়েটারকে আবার অভিনয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে হল। জীবনমুখী থিয়েটারের প্রাণ হল অভিনয়—"গান্ধার"-এর "নীলাম নীলাম" সেই সত্যই আবার আমাদের সামনে উপস্থিত করল। প্রত্যেকটি চরিত্রই অত্যন্ত সু-অভিনীত এই প্রযোজনায়। কিন্তু বিজয়নারায়ণের চরিত্রে অসিত মুখোপাধ্যায় ও সঞ্চয়নারায়ণের ভূমিকায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় যে বুদ্ধিদীপ্ত, সংহত অভিনয় করেছেন তাকে শুধুমাত্র "সার্থক" বললে কিছু বলা হয় না। স্বরবিন্যাস, দৃষ্টিক্ষেপ, চলনের গুণে চরিত্র দুটি আদ্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠে। "আত্মকথা"-র মতো এই প্রযোজনার অভিনয় দেখতে-দেখতে মনে হয় সংলাপগুলি যেন লেখা হয় নি, এই প্রথম বলা হচ্ছে। শৈলমোহন চরিত্রে সুকুমার ঘোষের অভিনয় অত্যন্ত উঁচুদরের। চরিত্রের মজাদার দিকটির সঙ্গে তার অন্তর্লীন গভীরতা আর ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম তিনি। শিপ্রা লাহিড়ীর অভিনয় স্বচ্ছন্দ কিন্তু 'অনীতা' নামের পুরো মানুষটি, যিনি একসময় কবিতা লিখতেন, সন্তানবিচ্ছেদের কষ্টে কাতর যিনি, তাঁকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না তাঁর চরিত্রায়ণে। পেলে হয়তো সামগ্রিক অভিনয় আরো জোরালো হত।

নান্দীকারকে ধন্যবাদ—তাঁরা পঞ্চম নাট্যমেলার জন্য এই-বাঙলা থেকে এবার একটি যোগ্য প্রযোজনা নির্বাচন করেছেন। পেছনে তাকিয়ে মনে হয়, এর আগের নাট্যমেলাগুলিতে "রানীকাহিনী" বা "নাথবতী অনাথবৎ"-এর মতো প্রযোজনাকে বেছে নিয়ে বাঙলার ইদানীংকার নাট্যচর্চার প্রকৃত স্বরূপটির সঙ্গে বহির্বাগত নাট্যশিল্পীদের পরিচিত হবার সুযোগ দিতে পারতেন তাঁরা।

যবনিকা

এবার নাট্যমেলায় একটাই অভাববোধ ছিল—দক্ষিণী নাট্যশিল্পের কোনো প্রতিনিধি-গোষ্ঠীর অনুপস্থিতি। ইতিপূর্বেই দক্ষিণী একটি গোষ্ঠী (স্পন্দনা, ব্যাঙ্গালোর) বাঙলার দর্শকসমাজকে মুগ্ধ করেছেন। আশা করা যায়, আগামী নাট্যমেলাগুলিতে দক্ষিণের প্রযোজনা দেখার সুযোগ হবে।

পাঁচ বছরের নাট্যমেলার অভিজ্ঞতার পর একটি প্রশ্ন বড়ো হয়ে ওঠে—এই নাট্যোৎসব কি আদৌ বাঙলার থিয়েটারকর্মী বা দর্শকদের কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে ? কোনো আদান-প্রদান কি ঘটেছে বাঙলা থিয়েটারের সঙ্গে অন্যান্য প্রাদেশিক নাট্যের ? নাকি পুরোটাই একটা উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনার স্তরে থেকে গেছে ? যদি বার্ষিক নাট্যমেলার ঐতিহ্য নান্দীকার বজায় রাখতে পারেন, হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতে। কিন্তু তার জন্য দরকার আগামী কয়েক বছরের নাট্যমেলার আয়োজন যার সব দায়ভার একা নান্দীকারের কাঁধে না চাপিয়ে কলকাতার সমস্ত নাট্যোৎসাহীর এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সামনের বছরগুলিতে আবারও পশ্চিম বাঙলার দর্শকের সামনে নান্দীকার নিয়ে আসুন উপমহাদেশীয় নাট্যের বৈচিত্র্যময় সম্ভার—এই আশার সুরে হোক এ আলোচনার যবনিকাপতন।

With Best Compliments from :

BENFED THE FARMER's FRIEND

BENFED is a familiar name among the farmers of West Bengal. Through its hundreds of Primary Co-operative Societies and 14 District Offices, BENFED comes closer to the farmers to fulfil their needs.

SOME OF BENFED's BUSINESS ACTIVITIES ARE :

- Distribution of Chemical fertilisers, quality seeds and pesticides.
- Distribution of Pumpsets and Shallow Tubewell Accessories.
- Marketing of Raw Jute & Jute Products.
- Marketing of Vegetables, Pulses, Spices and other Agricultural Products.
- Owner of the only Modern Rice Mill in West Bengal.

The West Bengal State Co-operative Marketing Federation Limited (BENFED)

Regd. Office :
4, GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA-700 013

Business Office :
18, RABINDRA SARANI (PODDAR COURT)
(Gate No. 3 & 4, 7th Floor)
CALCUTTA-700 001